শুকতারা
ষড়্‌বিংশ বর্ষ • নবম সংখ্যা
কার্তিক • ১৩৮০

রহস্যময় অভিযাত্রী

যুদ্ধ চলছে। ত্রয়োদশ দিনে নামলেন অভিমন্যু। অর্জুনের ছেলে। তিনি কৌরব পক্ষের কঠিন ব্যূহে প্রবেশ করলেন। কিন্তু আর বের হতে পারলেন না। জয়দ্রথ আটকে দিয়েছিল পথ। ফলে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ,—এমনি সব বাঘা বাঘা লড়িয়েরা ঘিরে ফেলল তাঁকে। অন্যায়ভাবে নিহত হলেন বালক বীর।...

—এবার জয়দ্রথ বধ। ঘোষণা করলেন ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ অর্জুন। জয়দ্রথকে মারা শক্ত। সূর্যাস্তের আগে মারতে হবে। দেখতে হবে মাথা যেন মাটিতে না পড়ে। কৃষ্ণ সূর্যকে আড়াল করে রাখলেন। অর্জুনের বাণ জয়দ্রথের কাটা মাথা ছুঁড়ে দিল তার বাবার কোলে।...

অমৃত সমান
মহাভারত-কথা
বোরোলীন
হাউস কর্তৃক প্রচারিত

পনের দিনের মাথায় নিহত হলেন আচার্য দ্রোণ। তাঁকে নিয়ে পাণ্ডবদের খুবই দুশ্চিন্তা। সুতরাং, চালাকি করতে হল। যুধিষ্ঠির বললেন—অশ্বত্থামা মারা গেছে। যেন দ্রোণের ছেলে মারা গেছেন। দ্রোণ ভেঙে পড়লেন। আসলে মারা গিয়েছিল ওই নামে একটি হাতি।

বোরোলীন
সুরভিত
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
কাটা-ছেঁড়া-কাটা, রক্ষ-শুষ্ক
কিংবা ঝলসানো ত্বকের
অনবদ্য নিরাময়—।

(চলবে)

বাঁটুল দি গ্রেট

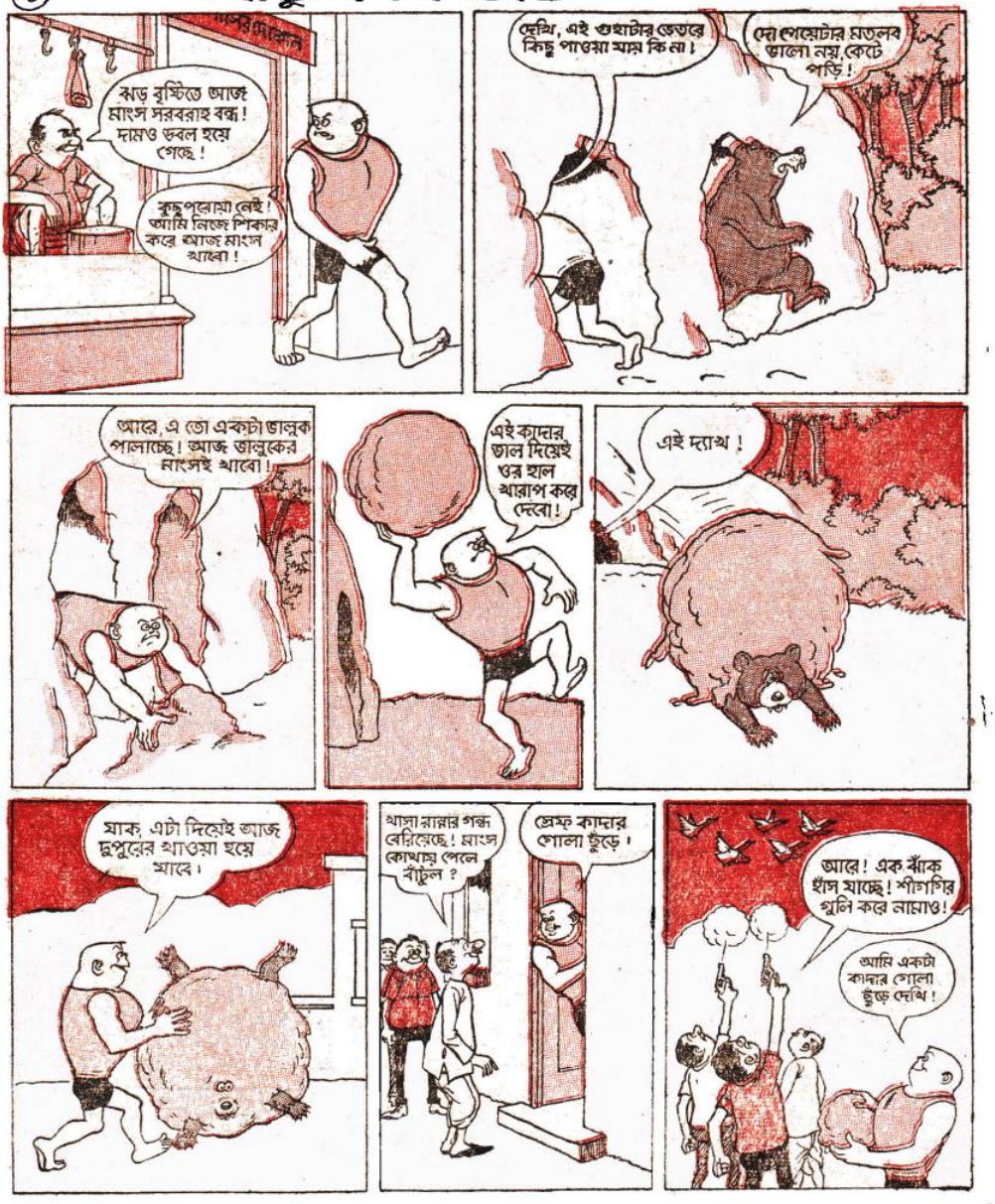

কার্তিক—

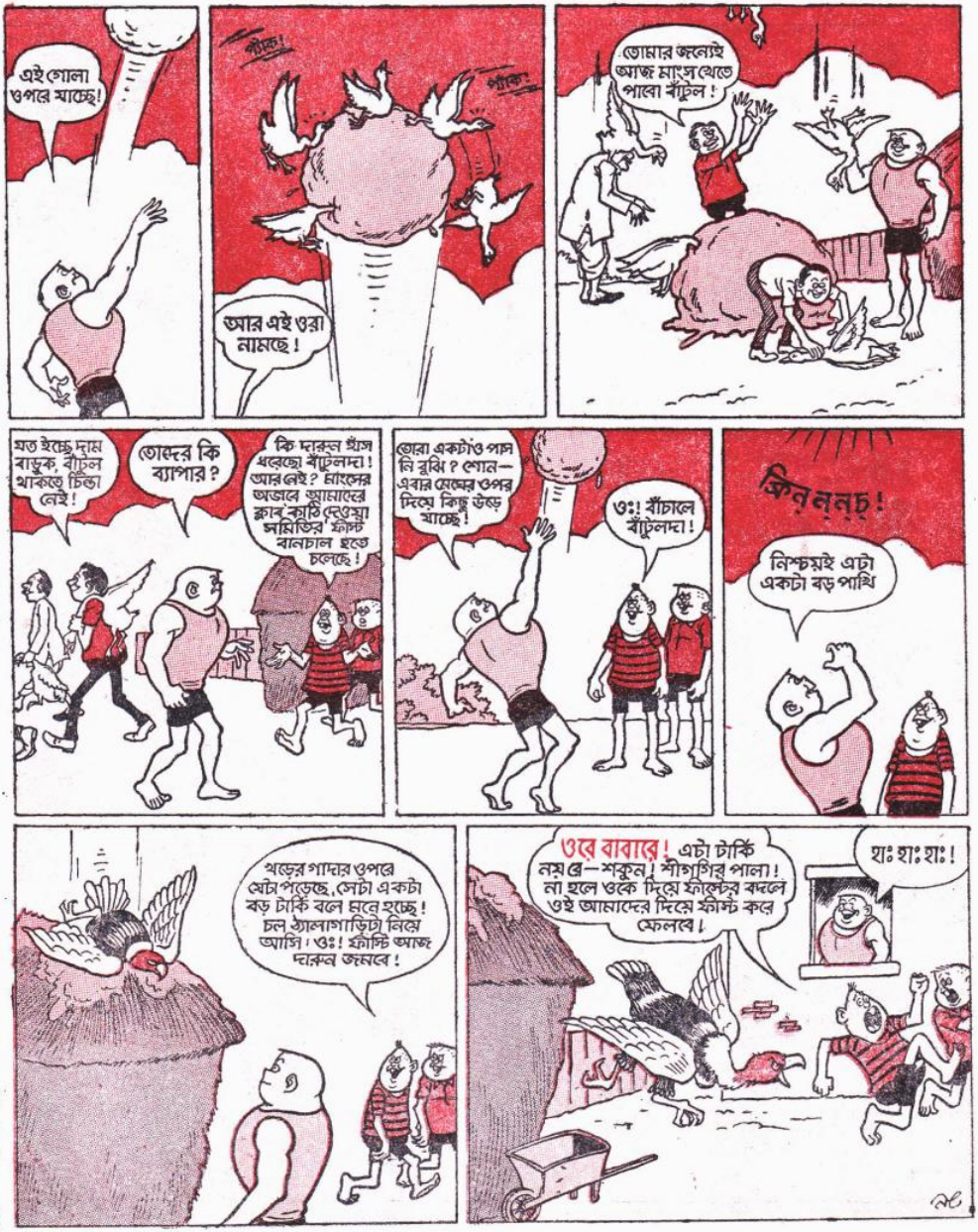

এই গোলা ওপরে যাচ্ছে!
প্যাঁক!
প্যাঁক!
আর এই ওরা নামছে!
তোমার জন্যেই আজ মাংস খেতে পাবো বাঁটুল!
যত ইচ্ছে দাম বাড়ুক, বাঁটুল থাকতে চিন্তা নেই!
তোদের কি ব্যাপার?
কি দারুন হাঁস ধরেছো বাঁটুলদা! আর নেই? মাংসের অভাবে আমাদের ক্লাব কাটি দেওয়া সমিতির ফীস্ট বানচাল হতে চলেছে!
তোরা একটাও পাস নি বুঝি? শোন— এবার মেঘের ওপর দিয়ে কিছু উড়ে যাচ্ছে!
ওঃ! বাঁচালে বাঁটুলদা!
ক্রিনননচ্!
নিশ্চয়ই এটা একটা বড় পাখি
খড়ের গাদার ওপরে যেটা পড়েছে, সেটা একটা বড় টার্কি বলে মনে হচ্ছে! চল ঠ্যালাগাড়িটা নিয়ে আসি। ওঃ! ফীস্টি আজ দারুন জমবে!
ওরে বাবারে! এটা টার্কি নয় রে—শকুন! শীগ্‌গির পালা! না হলে ওকে দিয়ে ফীস্টের বদলে ওই আমাদের দিয়ে ফীস্ট করে ফেলবে।
হাঃ হাঃ হাঃ!

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—কার্তিক, ১৩৮০

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	রহস্যময় অভিযাত্রী ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রথম ছবি
৩।	তোমরা রেখো জেনে (কবিতা) ...	মণ্টু সরকার ...	৬১৩
৪।	সুন্দা নরেশ রণশূর (অমর বীর কাহিনী) ...	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	৬১৫
৫।	আজব ছবি (মজার ছবি) ...	— ...	৬২৩
৬।	নিকোলাসের গল্প (জীবন কথা)	তাপসেন্দ্রনাথ বসু ...	৬২৪
৭।	বুদ্ধির খেলা ...	— ...	৬২৮
৮।	জীবন্মৃতের জাদুঘর (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ) ...	শ্রীবৈজ্ঞানিক ...	৬২৯
৯।	৬২৮ পৃষ্ঠার প্রশ্নের উত্তর ...	— ...	৬৩৮
১০।	নটিলাস (জীবন কথা) ...	সুনীলরঞ্জন দত্ত	৬৩৯
১১।	কার্টুন ...	— ...	৬৪১
১২।	সোনা ও রূপা (ছবিতে গল্প) ...	দিলীপ দাস ...	৬৪২
১৩।	তেরো ডাইনির মজলিশ (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৬৪৪
১৪।	বিচারালয় (জানবার কথা) ...	— ...	৬৫৬
১৫।	জাবালুজা ও টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) ...	সব্যসাচী ...	৬৫৭
১৬।	"সিদ্ধার্থ বসু স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)	...	৬৬৫
১৭।	হাঁদা-ভোঁদার ফাঁদপাতা (ছবিতে গল্প) ...	— ...	৬৬৬
১৮।	সোনার ঘণ্টা (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	অনিল ভৌমিক ...	৬৬৮
১৯।	কার্টুন ...	— ...	৬৭৬
২০।	বিভূতিভূষণ ও বালক কবি (জীবন কথা ...	হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬৭৭
২১।	কুতুর চ্যালেঞ্জ (মজার ছবি) ...	— ...	৬৭৮
২২।	ফলন্ত ব্যাটারী (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	শ্রীঅদিতিকিশোর সরকার ...	৬৭৯
২৩।	৬৭৮ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর ...	— ...	৬৮৩
২৪।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...	— ...	৬৮৪

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট. কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৮০ পয়সা

everest/547/PP ben

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৩৮০, কার্তিক

তোমরা রেখো জেনে

মণ্টু সরকার

পাগলাচণ্ডীর চণ্ডীচরণ চড়কডাঙার মোড়ে
চড়বড়িয়ে বেড়ায় ঘুরে
উল্টো গাধায় চড়ে।
উল্টোডিঙির পল্টু কোলে
কুস্তি লড়ে আখড়ায়
দু'হাতে বুক চাপড়ায়,
আনাড়ীদের নাড়ী ধরে
হাত পা ছুঁড়ে কাতরায়।
গোয়ালন্দের গোয়ালপতি গোলকহরি ঘোষ,
পোষেন হাজার মোষ,
শুতে দেবার জন্যে তাদের
কেনেন তক্তপোশ।

আজিবপুরের রাজীববাবু
নতুন বাজার গিয়ে
রাজ্য কেনার ফন্দী ফাঁদেন
বিনে পয়সা দিয়ে।
তোপচাঁচির ওই তপনকুমার
তেপান্তরের মাঠে
পক্ষিরাজে চড়ে গেলেন
দেখতে বড়লাটে।
নলহাটীর ঐ নীলু খুড়োর
আড়াই গজি দাড়ি
সাতমহলা বাড়ি,
যাকে দেখেন তাকেই বলেন
চলো আমার বাড়ি
কিনে দৈ-এর হাঁড়ি।

পটলডাঙার পাল পটলা
পাঁচটা পটল কিনে,
চালান হলেন চীনে
রাত্রি দেখেন দিনে।
এসব কথা সব শুনেছি
গোষ্ঠ দাদুর মুখে
চোখ বুজিয়ে সুখে,
ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ তোলেন
খেলো হুঁকো টেনে
তোমরা রেখো জেনে।

দুঃসাহসিক রণশূর

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

সুদূর তাঞ্জোরে এক বৃদ্ধা রাজমাতা এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন—মা-গঙ্গা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন, শঙ্খ-বলয়-পরা শঙ্খধবল করপদ্মের তিনটি অঙ্গুলি ঈষৎ উত্তোলন করে নীরব ভাষায় যেন আহ্বান করছেন—"আয় মেয়ে, এত শীতল নির্মল পাপ-তাপ-বারণ সলিল সম্ভার নিয়ে বসে আছি আমি। একবার স্নান করে তৃপ্ত হবি না?"

রাজমাতা সকালে উঠেই পুত্রকে ডেকে পাঠালেন—"মা জাহ্নবী আমায় ডেকেছেন, গঙ্গাতীরে পাঠিয়ে দে আমায়।"

রাজেন্দ্র চোল মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। এমন সব অসুবিধাজনক স্বপ্নও বুড়ো বুড়ীরা দেখতে পারে! মা ত স্বপ্ন দেখেই খালাস। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যে কী কঠিন ব্যাপার, তা ত আর তিনি খতিয়ে দেখেন নি! রাজেন্দ্র চোলের রাজধানী হল তাঞ্জোরে, বলতে গেলে দাক্ষিণাত্যেরও দক্ষিণ প্রান্তে। আর গঙ্গা? পতিতোদ্ধারিণী সুরধনী সেই উত্তর-ভারতের উত্তর সীমানায়। হিমালয়ের চিরতুষার-ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভব, হিমালয়ের কোল ঘেঁষে ঘেঁষেই উত্তরভারতের সমতল ভেদ করে তিনি প্রবাহিতা। পুবে আসতে আসতে ক্রমশঃ দাক্ষিণমুখিনী হয়েছেন বটে, কিন্তু সাগর সঙ্গমের স্থানটা ত পক্ষিদেশ! বেদে পুরাণে নিন্দিত! সেখানে তীর্থবাস করতে যাওয়ার কোন রীতি আর্য বা দ্রাবিড় ভদ্রসমাজে কুত্রাপি নেই।

বাস করবার উদ্দেশ্যে মগধ পর্যন্ত যাওয়া চলে। মগধে গঙ্গাতীরে আছে পাটলি-পুত্র। কিন্তু সেখানে চোল রাজার মা যান কেমন করে? নিজের দেশে বৃদ্ধা রানী

সুরঙ্গমা হচ্ছেন সম্রাটজননী, দেবীর মতই সম্মানিতা। পাটলিপুত্রে তাঁকে কে কতটুকু খাতির করবে? চোলদের কোন প্রতিপত্তি সেখানে নেই।

অধিকার করে নেওয়া? খুব সহজ কথা নয়। মোটেই না। খাস মগধে অবশ্য এখন তেমন কোন পরাক্রান্ত রাজা নেই। মৌর্য গুপ্ত সম্রাটদের রাজধানীতে সর্বশেষ শক্তিমান চক্রবর্তী নরপতি যিনি রাজত্ব করেছিলেন, তিনি হলেন পালবংশীয় দেবপাল। অবশ্য পাটলিপুত্র ছিল তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী। তিনি বাস করতেন গৌড়ে। সেখানেই তাঁর বংশধরেরা এখনও রাজত্ব করে যাচ্ছেন কোন রকমে। তবে তাঁদের আর সে পূর্ব প্রতাপ নেই, কিন্তু গৌড়, ঐ যে! পক্ষিদেশ নিন্দিত দেশ!

যাওয়া যেতে পারে পাটলিপুত্রে। এখনও সে মহানগরী গৌড়েশ্বরের অধিকারে রয়েছে বটে, এবং গৌড়েশ্বর বর্তমানে নখদন্তহীন বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের মতই অসহায় বটে, কিন্তু মগধে আক্রমণ হলে অনধিকারী এক পক্ষ প্রতিবাদ তুলবে উঁচু গলায়। তারা হল কনৌজের গাহড়বাল। ওরা প্রচুর সামরিক শক্তি সঞ্চয় করেছে, মগধের উপরে অবশ্যই তাক আছে ওদের, অপেক্ষা করছে শুধু উপযুক্ত যোগাযোগের।

হতে পারে, চোল সম্রাটের মত অত শক্তিমান নয় গাহড়বালেরা। অন্ততঃ এখনও নয়। সম্মুখযুদ্ধে ওরা না পেরে উঠতে পারে রাজেন্দ্র চোলের অক্ষৌহিণী সেনার সাথে। কিন্তু ওরা আছে স্বস্থানে, চোল সেনাকে যেতে হবে সাতশো ক্রোশ পথ অতিক্রম করে। সরবরাহ ঠিক রাখা দারুণ শক্ত হবে অত দূরে। আর নিয়মিত সরবরাহই হল দূরাঞ্চলের অভিযানের জিয়নকাঠি মরণকাঠি। ওটা যদি ভেঙে পড়ে, পরাজয় অনিবার্য।

এই ধরা যাক, যবদ্বীপ, কম্বোজ, চম্পার কথা। একটা গোটা সমুদ্রপারে ওদের অবস্থান, দূরত্ব ওদিকেও সাত-আটশো ক্রোশ। কিন্তু সরবরাহ ঠিক রাখতে কোন বেগই পেতে হয় নি। ভারতের উপকূল থেকে নৌবহর ভেসেছে, সোজা গিয়ে ভিড়েছে যবদ্বীপে। দৈনিক গিয়েছে রসদভর্তি জাহাজ। যুদ্ধও অনায়াসে জয় হয়েছে। সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ গড়ে উঠেছে সেখানে। দূর যতই হোক, পথ ছিল মুক্ত, অবাধ।

এখানে কিন্তু বাধা অসংখ্য! স্থলপথেও বটে, জলপথেও বটে। জলপথের কথাই আগে ধরা যাক। সমুদ্রতীরে কোন বন্দর নেই গঙ্গার মোহনায়। দুর্ভেদ্য অরণ্য সেখানে, শত শত যোজন বিস্তৃত। শোনা যায় সেখানে রাজকীয় বহরের বিচিত্র বপু নিয়ে বিরাজ করে এক জাতীয় মহাশার্দূল, যাদের শক্তি, চাতুর্য এবং জিঘাংসা সবই অতুলনীয়। যমরাজার ফাঁদ সেই মহারণ্যের ভিতর গঙ্গার বুকে চোল সৈন্য কিনা বিপত্তির সম্মুখীন হতে পারে! মহাভুজঙ্গিনীর ঐ নিম্নাংশে স্রোতের গতি-প্রকৃতি কী রকম,

ওর তীরে তীরে কারা বাস করে, তাদের শক্তি এবং স্বভাব কী জাতীয়, কিছুই জানা নেই। এ অবস্থায় ওপথে সৈন্য পাঠানো রণনীতিসম্মত হবে না।

বাকী রইল তাহলে স্থলপথ। কলিঙ্গের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্মদেশ, তার পূর্বে উত্তরে বাঁকে বাঁকে গঙ্গা প্রবাহিতা। যেদিকে খুশী যাও। গৌড় পর্যন্ত যেতে পার, গৌড় ছাড়িয়ে পাটলিপুত্রে যেতে পার, আর যদি পক্ষিদেশের আবহাওয়া সহ্য হবে বলে মনে কর, তাহলে গৌড়ের এধারেই গঙ্গাতীরের কোন নগরে—

কিংবা নতুন নগর একটা গড়েও নেওয়া যেতে পারে রাজমাতার পছন্দ অনুযায়ী স্থানে। প্রথম কথা, ও-অঞ্চলে কোথাও অবস্থান তাঁর মনঃপূত হবে কিনা, এবং মনঃপূত হলেও দক্ষিণী ব্রাহ্মণ সমাজের অনুমোদন যোগ্য হবে কিনা। ওঁদের শাসন অতি কঠোর। রাজাকেও তা নতশিরে মেনে চলতে হয়। অমান্য করলে দণ্ড দেবার সামর্থ্য এবং সাহস দুটাই আছে তাঁদের। আগে নিতে হবে ওঁদের অনুমতি।

কিন্তু হায়, যা আশঙ্কা করা হয়েছিল, ঘটল ঠিক তাই। তাঞ্জোর কাঞ্চী সেতু-বন্ধের পণ্ডিতবর্গ এক বাক্যে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। গঙ্গা পুব মুখে প্রবাহিত হতে হতে হঠাৎ যেখানে দক্ষিণবাহিনী হয়েছেন, সেই স্থানেই গঙ্গার মহিমা লুপ্ত হয়েছে। ওর নিম্নাংশ পুণ্যসলিলা নয়, ওর সলিলে তীর্থোদকের গুণাবলী অনুপস্থিত। ওখানে রাজমাতার বাসস্থান নির্দিষ্ট করাও যা, তাঁকে নরকে প্রেরণ করাও তা।

রাজেন্দ্র চোল বিপন্ন হয়ে পড়লেন। জেনে শুনে জননীকে তিনি নরকে পাঠান কেমন করে? মা নিজেই বা সেখানে যাবেন কেন? গঙ্গাতীরে তিনি বাস করতে চেয়েছেন স্বর্গ কামনায়। নরকবাসের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা নেই। যেখানে গঙ্গার কূল বারাণসী সমতুল, এমন কোন স্থানে তাঁকে পাঠানো কি তাঁর সম্রাট্-পুত্রের অসাধ্য?

হায়, কে বোঝে সম্রাটের অসুবিধা? জননীর পুত্র হলেও, তিনি চোল জাতির সম্রাট্। দূরবর্তী গাহড়বাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চোল জাতির কল্যাণ হবে কিনা সন্দেহ। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয়, সমূহ লোকসানেরই আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। কী করা যায়? তা হলে কী করা যায়?

মন্ত্রী সেনাপতিরা পরামর্শ দেন, এক একজনে এক একরকম। সমস্যার প্রকৃত সমাধানের আশা কোন দিকেই দেখতে পান না সম্রাট্। অবশেষে বিদূষক রসগোবিন্দ স্বভাবসিদ্ধ সরসকণ্ঠে একদিন বলে উঠল—"যাক গে, রানীমাকে গঙ্গায় পাঠিয়ে দরকার নেই, গঙ্গাকেই রানীমার কাছে এনে দেব আমরা।"

সভাসুদ্ধ লোক বিরক্ত হয়ে উঠল এই অসময়োচিত রসিকতায়, একমাত্র সম্রাট্ ছাড়া। তিনি হঠাৎ আলো দেখতে পেলেন। জটিল সমস্যার সমাধানের সূত্র একটা

দেখতে পাওয়া যায় যেন। তিনি রসগোবিন্দর পিঠ চাপড়ে দিলেন, গলা থেকে এক গাছা রত্নমালা খুলে তার মাথায় জড়িয়ে দিলেন। সে বেচারা ত ভেবেই পায় না যে কী এমন মূল্যবান বাণী সে শ্রীকণ্ঠ থেকে নিঃসারিত করেছে, যার দরুন এমন রাজকীয় পুরস্কার সে প্রত্যাশা করতে পারে। যা সে বলেছিল, ভেবেচিন্তে বলেনি। সেটা একটা তৃতীয় শ্রেণীর রসিকতা ছাড়া কিছু নয়, যার দরুন সম্রাট্ তার উপর রেগে উঠলেও সে বলতে পারত না যে অকারণে রেগেছেন তিনি।

যা হোক সভাভঙ্গের পরে মন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তর মন্ত্রণা করলেন সম্রাট্। এবং পরদিন দু'ইজন দূত পাঠালেন, কলিঙ্গে এবং গৌড়ে। বিস্তর শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্যের বাণীপত্র দুখানিতে। তারপর অনুরোধ একটা। সম্রাট্জননীর নিত্য ব্যবহারের জন্য গঙ্গোদক প্রয়োজন। গৌড়েশ্বর এবং কলিঙ্গেশ্বর অনুমতি দেন যদি, তাঞ্জোরের হস্তিযূথ নিত্য কয়েক জালা করে জল গঙ্গা থেকে নিয়ে আসবে তাঞ্জোরে। গৌড়েশ্বর যে স্থান নির্বাচন করে দেবেন, সেই স্থান থেকেই আহরণ করা হবে গঙ্গাজল। কেবল কথা এই যে, সেই স্থানটি হওয়া দরকার এমন কোন বাঁকের উপরে, যা দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার উজানে অবস্থিত। কারণ শাস্ত্রমতে গঙ্গা দক্ষিণে বাঁক নেওয়ার পরে তার পুণ্য সলিলের পবিত্রতা কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

দুই দূত চলে গেল। এবং যথাসময়ে কলিঙ্গ থেকে একজন ফিরেও এল। কলিঙ্গরাজ গণপতিদেব শিষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছেন—জল আনবার জন্য হস্তিযূথ যাবে, তাতে আপত্তি কিছু নেই। কারণ একে ত লোকের পুণ্যকর্মে বাধা দেওয়া অনুচিত, তায় আবার চোল সম্রাটের সদিচ্ছা ও বন্ধুত্ব কলিঙ্গের সর্বদাই কাম্য। কেবল অনুরোধ, হস্তিযূথের চলাচলের জন্য কলিঙ্গবাসীদের যাতে কোনরকম ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়, তা যেন চোল সম্রাট্ দেখেন। তা ছাড়া, ঐ উদ্দেশ্যে রাস্তাঘাট যদি একটু সংস্কার করিয়ে দেন সম্রাট্ নিজের ব্যয়ে, তাহলে হয় ভাল। বলতে গেলে রাস্তা-নামের উপযুক্ত কোন রাস্তাই নেই কলিঙ্গের বনাঞ্চলে।

রাজেন্দ্র চোল পরিতুষ্ট। রাস্তা? তা না হয় দেওয়া যাবে সংস্কার করে। ব্যয় কিছু হবে, কিন্তু যুদ্ধ করতে হলে ব্যয় হত আরও অনেক অনেক বেশী।

সম্রাট্ এইবার প্রতীক্ষায় রইলেন—গৌড় সম্রাটের কাছ থেকে কবে উত্তর আসে। মহীপালদেব কিছুদিন আগে পর্যন্ত গাহড়বাল আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য বিব্রত ছিলেন খুবই। সে সংবাদ তাঞ্জোর দরবারের অজ্ঞাত নেই। তবে এখন সেদিকে সন্ধি হয়ে গিয়েছে একটা। মহীপাল অবশ্যই সময় পাবেন চোল রাজের পত্রের উত্তর দিতে। চোল দূত ত সেই থেকে বসেই আছে গৌড়ে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে এল গৌড়ের পত্র। চোল দূত পাল সম্রাটের আতিথেয়তায় মুগ্ধ। গৌড় রাজধানী এবং গৌড় প্রান্ত বাহিনী জাহ্নবীর সৌন্দর্য ব্যাখ্যানে পঞ্চমুখ এবং গৌড়ে পাকাপাকিভাবে বাস করলেও সম্রাট্‌জননীর যে কোন কষ্ট হবে না, এ-বিষয়ে নিঃসংশয়।

হ্যাঁ, দূতের মুখে যা শোনা গেল, তা সবই ভাল লাগল রাজেন্দ্র চোলের কিন্তু তত ভাল লাগল না মহীপালদেবের চিঠির বয়ান। প্রচুর শুভেচ্ছার বাণী মহীপালের পত্রেও আছে। কিন্তু হ্যাঁ না কোন নির্দিষ্ট জবাব তিনি কিছুই দেনান। যা লিখেছেন, তার মর্ম হল এই যে কলিঙ্গ সীমা থেকে শুরু করে কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ সূহ্মদেশ, সেটা গৌড়েশ্বরের রাজ্যাংশ হলেও সেখানে প্রত্যক্ষ শাসনভার ন্যস্ত আছে স্থানীয় সামন্ত মহারাজ রণশূরের হস্তে। কাজেই চোল সম্রাটের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপনের পূর্বেই গৌড়েশ্বরের কর্তব্য হল সেই রণশূরের সম্মতি সংগ্রহ করা। তা নইলে ভবিষ্যতে একটা অপ্রীতিকর জটিলতার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। রণশূরকে সংবাদ দেওয়া হল। তিনিও সাগ্রহে রাজী হয়ে যাবেন বলে আশা করা যায়। তাঁকে বলা হয়েছে উত্তরটা সরাসরি তাঞ্জোরে পাঠিয়ে দিয়ে তার একটা অনুলিপি গৌড়ে দাখিল করবার জন্য।

চোলসম্রাট্ ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন বিরক্ত হয়ে। সামান্য গঙ্গাজল নিয়ে এত জল ঘোলা করতেও পারে এই গৌড়িয়ারা! মহীপালদেব যে কী রকম রাজা, সে সম্পর্কে বেশ একটা ধারণা করে নিলেন রাজেন্দ্র চোল। এই তুচ্ছ ব্যাপারে সামন্তের মর্জির উপরে যে অধিরাজকে নির্ভর করতে হয়, তার উচিত হচ্ছে কলসি গলায় বেঁধে গঙ্গায় ডুব দেওয়া!

তবু রণশূরের উত্তরের জন্য প্রতীক্ষায় রইলেন সম্রাট্। করা যায় কী?

এল উত্তর অবশেষে। আশ্চর্যরকম সংক্ষিপ্ত এবং শাণিত।

"বড়ই পরিতাপের ব্যাপার হল। কলিঙ্গের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বর্তমানে তিক্ত। নিত্যনিয়মিত গজবাহিনী যদি কলিঙ্গের উপর দিয়ে গৌড়ের এলাকায় প্রবেশ করতে থাকে, তবে সেই হাতীরই পিঠে বসে কলিঙ্গের গুপ্তচরেরা যে এ রাজ্যে প্রবেশ করবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? গৌড়েশ্বর মহীপালদেব এই ক্ষুদ্র সামন্তকে এ-ব্যাপারের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বলেই সরাসরি চোলসম্রাট্‌কে এ-জবাব দিতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি। অপরাধ মার্জনীয়।"

বটে! চোলসম্রাটের আর ধৈর্য রইল না। এক আঙুল পরিমাণ একটা ভূঁইয়া রাজা, তার স্পর্ধা দেখ না! গুপ্তচর? গুপ্তচরের দোহাই দিয়ে চোলসম্রাটের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান? এ-ধৃষ্টতার প্রতিফল না দিলে ইজ্জত থাকে না রাজেন্দ্র চোলের। সারা ভারত হাসবে একথা জানাজানি হলে। আর জানাজানি না হবারও ত কারণ কিছু নেই।

ঐ সামন্তটা—ঐ সুহ্মদেশের রণশূরই জানাবে। ডেকে ডেকে জানাবে সবাইকে, কেমন করে সে চোল-রাজেন্দ্রের থোঁতামুখ ভোঁতা করে দিয়েছিল।

অতএব সেই সৈন্যই সাজাতে হল শেষ পর্যন্ত। ভারতের অবস্থা তখন এই রকম যে যুদ্ধ ছাড়া তুচ্ছতম কলহের নিষ্পত্তি হয় না। সবাই উপলক্ষ খুঁজছে, সর্বদা যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার। নেহাতই রণকণ্ডুয়ন! অব্যাহত মাৎস্যন্যায়! প্রতিবেশীকে উদরস্থ করা, বা নিজে প্রতিবেশীর উদরস্থ হওয়া—এটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" অবস্থ।

সাজল চোলের দিগ্বিজয় বাহিনী। কলিঙ্গরাজ গণপতি আগু বাড়িয়ে এসে চোল বাহিনীর সঙ্গে সর্বৈব সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সৈন্য চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট একটু মেরামত করে নিতে হবে, দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দিলেন সে কথাও। যেন-তেন প্রকারেণ চোলের খরচে কলিঙ্গে একটা রাজপথ বানিয়ে নেওয়ার জন্য রাজাটি বদ্ধপরিকর। রাজেন্দ্র চোল দরাজ হুকুম দিলেন—"খরচ আমার, কর রাস্তা। এখন চলুক সৈন্য, পরে পরে চলবে হাতী, জলের কলসী নিয়ে।"

কলিঙ্গ পার হয়ে সুহ্ম সীমান্তে উপনীত হল চোলবাহিনী। প্রতিরোধের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না কোথাও। রণশূর? কোথায় রণশূর? এইভাবেই কি শৌর্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন রণশূর? একটা বল্লমের ডগা কোন সর্ষে-ক্ষেত থেকে উঁচু হয়ে উঠছে না। একটা তীর সাঁ করে ছুটে বেরুচ্ছে না কোন বনের আড়াল থেকে। লড়াইয়ের নমুনাটি চমৎকার!

চোল সৈন্য চলে যায় মাঠ বেয়ে, লাঙ্গল তুলে ধরে কৃষক কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে দেখে তাদের পোশাকের চাকচিক্য। কেউ বা সাহস করে জিজ্ঞাসা করে, "কোন্ রাজার সেপাই তোমরা? কেন আসছ আমাদের দেশে?"

নিরীহ চাষী গ্রামবাসীর উপর কোনরকম অত্যাচার করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না ভারতের কোন রাজ্যের সৈনিক। যুদ্ধ হবে রাজায় রাজায়, প্রজার কী তাতে? দেশ-প্রেম? ভারতের যে কোন অংশের অধিবাসী হোক, প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রেম হল অখণ্ড ভারতবর্ষের উপরে। কোন্ ভূখণ্ড কোন্ রাজা দখল করে নিচ্ছে, তাতে সমগ্রভাবে ভারতের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নেই।

কয়দিনের জন্য নেবে? কয়দিন রাখবে দখলে? ভারতবাসী সার কথা বুঝেছে যদুপতের কঃ গতা মথুরাপুরী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী মথুরাই যখন অন্যের হাতে চলে গিয়েছিল, তখন যে কোন পার্থিব অধিকারের মেয়াদ কতদিন?

না, সুহ্মরাজ রণশূরের পাত্তা নেই, গৌড়ে বসে মহীপালদেব চিন্তিত, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন ক্রমশঃ। তাঁকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করে দিয়ে পাষণ্ড রণশূর এখন গেল

কোথায়? এই দুর্দম চোল-বাহিনীর মোকাবিলা করা কি তাঁর একক শক্তিতে সম্ভব?

তবু তিনি যথাসম্ভব রণসজ্জা করলেন বই কি! ধর্মপাল দেবপালের ঐতিহ্যের তিনি উত্তরাধিকারী। বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করা ত তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যাক প্রাণ, থাক মান। গাহড়বাল যুদ্ধে তিনি প্রমাণ করেছেন যে পূর্ববর্তী দুই পাল নরপতির মত তিনি মেরুদণ্ডবিহীন নন। প্রয়োজন যখন হয়েছে, তখন দাক্ষিণাত্য কেশরী রাজেন্দ্র চোলকেও সে প্রমাণ দেবেন তিনি।

চিঠিতে লেখা আছে— [পৃষ্ঠা ৬২২

রাজেন্দ্র চোল নিজে অবশ্য যুদ্ধে আসেননি। আসার দরকারও বোধ করেননি। বোধ করলেও আসা সম্ভব ছিল না। বঙ্গ-সাগরের দুই কূলে তাঁর দুই সাম্রাজ্য। এক একখানি জাহাজ ভারতের উপকূলে ভিড়ছে, আর বহন করে আনছে নতুন নতুন রণজয়ের কাহিনী, নতুন নতুন রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনের সুসংবাদ। তাঁর কি গৌড়ে ছুটে যাওয়া সম্ভব গঙ্গাজলের ব্যবস্থা পাকা করবার জন্য? তিনি যাননি, পাঠিয়েছেন পুত্র রাজরাজকে। বহুযুদ্ধজয়ী রণদক্ষ সেনাপতি ইনি।

রাজরাজের সঙ্গে এসেছেন গণপতি, কলিঙ্গদেশের রাজা। আসার কোন দায় ছিল না, তবু এসেছেন। এই সুযোগে রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে বন্ধুত্বটা পোক্ত করে নেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। যুদ্ধে যে গৌড়ের পরাজয় হবেই, এ আর না জানে কে? পরাজয় হলে

কলিঙ্গ সীমানার সন্নিহিত সুহ্মদেশের খানিকটা অন্ততঃ অনায়াসে রাজেন্দ্র চোলের কাছে চেয়ে নিতে পারবেন গণপতি। একা আসেননি। এনেছেন বৃহৎ একদল পদাতিক সেনা। কলিঙ্গ সেনার খ্যাতি আছে দক্ষ সৈনিক বলে।

সৈন্য এনেছেন, পরামর্শ দিচ্ছেন, রাজরাজের নির্দেশমত সৈন্যচালনাও করছেন মাঝে মাঝে। সর্বরকমে নিজেকে অপরিহার্য প্রমাণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন রাজাটি। সৈন্যদল কর্ণগড়ের সন্নিহিত হল। সুহ্মদেশের রাজধানী কর্ণগড়। প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের এখন ভগ্নদশা। মহারাজ আদিশূর, এই রণশূরেরই প্রপিতামহ, কর্ণগড় নগরী নির্মাণ করে এইখানে স্থাপন করেন তাঁর রাজপাট।

চোল সেনা অবাক্ হয়ে দেখল, কর্ণগড়ে রাজা ত দূরে থাকুক, একটা সৈনিকও নেই। "রাজা কোথায় তোমাদের?" এ প্রশ্নের উত্তরে নাগরিকেরা উত্তর দিল—"জানি না ত! আজ পক্ষকাল তিনি নিরুদ্দেশ।" কী আর করা যাবে? বিনা যুদ্ধে কর্ণগড় অধিকার করে সেখানে চোলপতাকা উড়িয়ে দিলেন রাজরাজ। নগরপালকে নির্দেশ দিলেন, এখন থেকে আদায়ী রাজস্ব গৌড়ে না পাঠিয়ে তাঞ্জোরে পাঠাতে হবে। নগরপাল উদাসীনভাবে বলল—"যথা আজ্ঞা?"

চোলসেনা গৌড়ের সন্নিহিত। মহীপালদেব নগরদ্বার রুদ্ধ করে বসে আছেন। দীর্ঘ অবরোধের জন্য প্রস্তুত তিনি। বরেন্দ্রীতে আদেশ পাঠিয়েছেন—তিস্তা মহানন্দার সমস্ত ছিপ এসে জমায়েত হোক গঙ্গায়, আর নদীবক্ষ থেকে তীরন্দাজেরা অনবরত শরবৃষ্টি করে যাক অবরোধকারী চোলসেনার উপরে।

একদিন এক পারাবত দূত উড়ে এসে বসল মহীপালের প্রাসাদচূড়ায়। তার পায়ে ছোট্ট চিঠি। লিখেছেন বঙ্গরাজ গোবিন্দচন্দ্র, তাঁর রাজধানী বিক্রমপুরে। সুহ্মরাজের মত ইনিও সামন্ত গৌড়চক্রের। চিঠিতে লেখা আছে—"রাজা রণশূরের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে আমি সসৈন্যে আসছি নৌকাপথে। পদ্মা হয়ে গঙ্গাতে পড়ব। তারপর মহারাজের যেমন আদেশ হবে, সৈন্য চালনা করব সেইভাবেই।"

সুসংবাদ। আরও স্বাগত জানাতে হয় এ-সংবাদকে এই জন্য যে, নিরুদ্দেশ রণশূরের খানিকটা উদ্দেশ পাওয়া গিয়েছে গোবিন্দচন্দ্রের চিঠি থেকে। লোকটা বেঁচে আছে তা হলে। কিন্তু এ কী? নিজে লড়ব না, বঙ্গরাজকে পাঠিয়ে দেব শত্রুনাশের জন্য, এ যে সেই বাঘ মারতে শত্রু পাঠানোর মত ব্যাপার!

না, ব্যাপার ঠিক তা নয়। রণশূরের খবর আরও পাওয়া গেল অচিরেই। এবং যেভাবে পাওয়া গেল, তা কলিঙ্গপতি গণপতির পক্ষে মারাত্মক। এক প্রসন্ন প্রভাতে হঠাৎ রণশূরের উদয় হয়েছে পুরীর সমুদ্রতীরে। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে কলিঙ্গ রাজধানী অবরোধ

করে বসেছেন তিনি। কলিঙ্গসেনার বৃহদংশ ত গণপতির সঙ্গেই চলে এসেছে গৌড় অধিকারের মতলবে। সামান্য যা অবশিষ্ট আছে রাজধানীতে, তাদের পক্ষে রণশূরকে বিতাড়িত করা কঠিন।

গণপতি নিজের সেনা নিয়ে পত্রপাঠ স্বরাজ্যের দিকে ছুটলেন। ওদিকে ভিন্ন পথে রণশূরও ছুটলেন গৌড়ের দিকে। দুটো বিপরীত মুখী সেনাদল পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, কয়েক ক্রোশ মাত্র ব্যবধান রেখে পরস্পরের সঙ্গে। রণশূর অবশ্যই খবর রাখছিলেন গণপতির গতিবিধির, যদিও গণপতির মনে তিলমাত্রও সন্দেহ জাগেনি যে শত্রুসেনার অস্তিত্ব একশো ক্রোশের মধ্যে কোথাও আছে।

চোল সেনা এখন তিনদিকে বেষ্টিত। উত্তরে গৌড়ের অভ্যন্তরে স্বয়ং মহীপাল, পুবে গঙ্গাজলে বঙ্গরাজ গোবিন্দচন্দ্র এবং বরেন্দ্রীর তীরন্দাজ সেনা, দক্ষিণে রণশূর। এই সময়ে যদি পশ্চিম থেকে কনৌজের গাহড়বাল বা চেদির কালাচুরি কেউ চিরশত্রু চোলকে কায়দা করবার জন্য ধেয়ে আসে, তাহলে দিগ্বিজয়ী চোল সেনার আত্মসমর্পণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকবে না। রাজরাজ নিজে থেকে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন সময় থাকতে।

মহীপালদেব কেন সন্ধি করবেন না? চোল সম্রাটের সঙ্গে তাঁর কোন বিবাদ নেই। গঙ্গাজল? রণশূর বললেন—"কিঞ্চিৎ খরচা ধরে দেবেন। আমরা আমাদের হাতীর পিঠে জল কলিঙ্গ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেব। সেখান থেকে তা তাঞ্জোরে নিয়ে যাবে আপনাদের হাতী। কলিঙ্গরাজের চর গৌড়ের এলাকায় ঢুকতে না পেলেই আমরা খুশী।"

আজব ছবি

— বৃষ্টিতে ভিজো না।
ঠাণ্ডা লাগবে।

নিকোলাসের গল্প

তাপসেন্দ্রনাথ বসু

ত্রিনিদাদের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই তোমরা। ক্রিকেটের জাদুপুরী ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরই এক দ্বীপের নাম ত্রিনিদাদ। এই ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট অফ স্পেন। সেই পোর্ট অফ স্পেনেরই এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে ১৯০২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করল একটি ছেলে। কুচকুচে কালো তার গায়ের রং, হাত-পাগুলো লম্বা লম্বা। তবে চেহারাটা মোটামুটি। বিছানায় শুয়ে থাকতো ছেলেটা আর দিনরাত কেবলই হাত-পা ছুড়ে চলতো। হাসি যেন ছেলেটার মুখে লেগেই থাকতো। কান্না যে কি জিনিস তা বোধহয় সে জানতোই না। ছোট্ট ছেলের এইরকম হাসিখুশী ভাব আর কার না ভাল লাগে? তাই আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীরা যেই দেখতো সেই দু'হাত বাড়িয়ে টেনে নিতো তাকে বুকের মাঝে। আদর করে অনেকেই নাম জিজ্ঞেস করতো ছেলেটাকে। ছোট্ট ছেলে কথাই বলতে শেখে নি, তাই তার হয়ে বাবা-মাই উত্তর দিতেন—নিকোলাস। হ্যাঁ, বাবা-মা নাম দিয়েছিলেন ছেলেটার নিকোলাস।

দিনে দিনে বড় হয়ে উঠতে থাকে নিকোলাস বাবা-মার স্নেহচ্ছায়ায়। বছর ছয় সাত বয়স হলো যখন নিকোলাসের তখন তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। কিন্তু শুধু লেখাপড়া করতে ভাল লাগে কারও? লাগে না। তাই খেলারও ব্যবস্থা হলো।

কিন্তু কি খেলবে সে এই বয়সে?

সমস্যার সমাধান নিকোলাসই করে দিল। ক্রিকেট—ক্রিকেট খেলবে সে। কারণ ওটাই তার প্রিয় খেলা। ব্যস, তারপর থেকেই শুরু হলো নিকোলাসের খেলা আর পড়া একই সঙ্গে। তবে পড়ার চাইতে খেলার দিকেই তার যেন বেশী আগ্রহ। ব্যাট হাতে উইকেটে দাঁড়িয়ে প্রতিটি বলকে বেধড়ক ঠ্যাঙানো তার কাছে লেখাপড়ার চাইতে অনেক প্রিয়।

একদিনের ঘটনা। নিকোলাসের বাড়ির কাছেই এক চিলতে খোলা মাঠে ক্রিকেট

খেলছিল নিকোলাস আর তার বন্ধুরা। দু'দলের মধ্যে খেলা হচ্ছে। নিকোলাসদের বিপক্ষ দল তখন ব্যাটিং করছে। আর মাত্র তিন রান করলেই জিতে যাবে বিপক্ষ দল। দৌড়ে এলো নিকোলাসের দলের একজন বল করার জন্য। ফুলটস বল। বিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানও সজোরে ব্যাট হাঁকড়াল। ব্যাটে বলে হওয়া মাত্র স্কোয়ার লেগের ওপর দিয়ে ছুটে গেল বল। নিশ্চিত বাউণ্ডারি এবং জয়ও।

কিন্তু না, বাউণ্ডারি ত নয়ই, জয়ও নয়, আউট। হ্যাঁ, আউট হয়ে গেলেন বিপক্ষ দলের শেষ ব্যাটসম্যানটি।

কি করে?

নিকোলাসের জন্য। বাউণ্ডারিতে যাচ্ছিল বল ঠিকই, কিন্তু যেতে দিল না নিকোলাস। বেশ খানিকটা দৌড়ে এসে থামাল সে সেই বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যাওয়া বলকে। আর তারপরই এক টিপে ছুঁড়ে দিল বলটা উইকেট লক্ষ্য করে। ছিটকে গেল স্টাম্প। বিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যান তখন ক্রীজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। সুতরাং—সুতরাং জিতলো নিকোলাসের দল। বন্ধুরা অভিনন্দন জানাল তাকে তার অসাধারণ ফিল্ডিংএর জন্য। ছেলেটার অর্থাৎ নিকোলাসের মনে কিন্তু আনন্দ নেই। বাড়ি ফেরার পথে নিজের মনেই ভাবছিল সে কিছুক্ষণ আগের খেলার কথা। যতই ভাবছিল ততই যেন বিরক্তিতে ভরে যাচ্ছিল তার মন। কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছিল না সে। যেরকম খেলতে চেয়েছিল তার কিছুই ত খেলতে পারল না সে। রান করেছে সে মাত্র তিরিশটা। উইকেট পেয়েছে একটা। একে কি আর ভাল খেলা বলা যায়? অথচ বাড়ি থেকে আসার পথে কত স্বপ্নই না দেখেছিল সে মনে মনে। সব কিছু যেন ছারখার হয়ে গেল।

"নাঃ, এরকমভাবে আর একদম নয়, আরও ভাল খেলতে হবে, আরও বড় হতে হবে।" মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল নিকোলাস।

তারপর—তার পরের ইতিহাস ধৈর্য আর সংগ্রামের ইতিহাস। ভাল খেলতে হবে, বড় হতে হবে, অন্তরের এই অনুভূতিই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। নীরবে, নিভৃতে অনুশীলন শুরু করে দিল সে। একটানা অনুশীলন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং তিনটে বিষয়েই সমান মনোযোগ নিকোলসের। দুচোখে তার অনেক স্বপ্ন—বড় হতে হবে, হতে হবে একজন দক্ষ অলরাউণ্ডার। আর তা হতে গেলে তিনটে বিষয়েই পারদর্শী হতে হবে। সুতরাং—

সুতরাং চলল তার সাধনা একনাগাড়ে।

বেশ কয়েক বছর পরের কথা। ১৯২১ সাল। নিকোলাসের বয়স তখন পাক্কা

উনিশ বছর। এই বয়সেই তিনি (হ্যাঁ, এখন আর 'সে' নয় 'তিনি' বলব) সর্বপ্রথম প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় আবির্ভূত হলেন ত্রিনিদাদের হয়ে ব্রিটিশ গায়নার বিপক্ষে। ব্যাটিং অথবা বোলিংএ তিনি উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেন নি, কিন্তু ফিল্ডিংটা বেশ ভালই করেছিলেন। ফলে এই ফিল্ডিংএর দৌলতেই তিনি ক্রিকেটে আবার সুযোগ পেলেন। পরের বছর ১৯২২ সালে আবার ব্রিটিশ গায়নার বিপক্ষে ত্রিনিদাদ দলে ডাক পড়ল তাঁর। এ সুযোগ তিনি আর নষ্ট করলেন না। রান করলেন দেড়শ, উইকেট নিলেন সাতটি। আর ফিল্ডিং ? ফিল্ডিংএ আবার ভেলকি দেখালেন। নিজের দলের ত বটেই এমন কি ব্রিটিশ গায়নার বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দেরও চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তাঁর অসাধারণ ফিল্ডিং দেখে। ব্যাটের ঘা খেয়ে যত জোরেই ছুটে আসুক না কেন বল কখনও গলতে দিতেন না। কুড়িয়ে নিতেন বল ছোঁ মেরে। তারপর একটিপেই ছুড়ে দিতেন উইকেট-কীপারের হাতে অথবা সোজা উইকেটে।

অথচ সবচেয়ে আশ্চর্য কি জান ?

এমন একজন খেলোয়াড়, একজন দক্ষ অলরাউণ্ডার কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট দলে জায়গা পান নি সহজে। কারণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেটে চলছে বর্ণবৈষম্যের যুগ। পাছে কোনো কালো চামড়ার লোককে দলে নিলে সাদা চামড়ার আধিপত্যে চিড় ধরে সেই ভয়েই শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায় নিকোলাসকে টেস্ট দলে জায়গা দিতে চান নি। কিন্তু একজন ভালো খেলোয়াড়কে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় ?

তাই নিকোলাসকে জায়গা দিতেই হল টেস্ট দলে। নিকোলাসের বয়স তখন ছাব্বিশ। সেটা ১৯২৬ সালের কথা। ইংলণ্ড সফরে গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। সেই দলেই জায়গা হল তাঁর। গেলেন ইংলণ্ড। আর তারপর, তারপরই নিকোলাস দেখাতে আরম্ভ করলেন তাঁর নিজস্ব বলতে যা কিছু ছিল সবই। ক্যালিপসো সুরের বন্যা বইল না তাঁর খেলায়। লেলিহান অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠল তাঁর ব্যাট। ইংলণ্ডের মাঠে মাঠে আগুন জ্বেলে দিলেন তিনি। যাঁরা এত দিন ক্রিকেটের শান্ত সুন্দর রূপটিই কেবল দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা এবার দেখলেন ক্রিকেটের বিদ্যুৎদীপ্ত চমক। যেখানেই গেলেন নিকোলাস সেখানেই জ্বলে উঠল আগুন। এ আগুন পুড়িয়ে ছারখার করে না কিছু, এ আগুনের আছে আশ্চর্য সুন্দর এক রূপ। এ আগুনের তাপে চোখ জুড়োয়, নয়ন সার্থক হয়।

নিকোলাসের কাছে এ যেন ভিনি ভিডি ভিসি, এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। আর সেই সঙ্গে দুচোখে অনন্ত বিস্ময় নিয়ে ইংলণ্ড তথা সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছিল ক্রিকেট ইতিহাসের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্বকে।

ইংলণ্ড সফরে নিকোলাস সব খেলা মিলিয়ে রান করলেন এগারশর মত, উইকেট

নিলেন শখানেক, আর ক্যাচ লুফলেন পঁচিশটির মত। অন্য কারো পক্ষে এই ধরনের কৃতিত্ব প্রদর্শন অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু নিকোলাসের কাছে এ যেন কিছুই নয়। নিজের খেলায় তিনি যেন সেই কথাই বলেছেন বারবার। ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ১৩০ রান করেছেন ৯০ মিনিটে। নর্দাম্পটনশায়ারের বিরুদ্ধে করেছিলেন ১০৬ রান, আর উইকেট নিয়েছিলেন ১৩টি। সামান্য দুটি দৃষ্টান্ত, কিন্তু যোগ্যতা ও দক্ষতা তাঁর কি ছিল তার প্রমাণ এ থেকেই মিলবে।

কিন্তু শুধু ইংলণ্ড নয়, অস্ট্রেলিয়াকেও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সেই মহান সত্যটিকে —কালোরাও ক্রিকেট খেলতে জানে। ১৯৩০ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অস্ট্রেলিয়া সফরে নিকোলাস আবার ইতিহাস লিখলেন। অস্ট্রেলিয়ায় শুধু ব্যাটিং নয় বোলিংএও তিনি ভেলকি দেখালেন। ঘণ্টায় ৯০ মাইল গতিতে তাঁর ফাস্ট বোলিংএর সামনে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি রব ছেড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। আর ব্যাটিংএ অস্ট্রেলিয়ার মাঠে মাঠে ইংলণ্ডের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন তিনি। নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে ৬০ রান করেছিলেন ৩৫ মিনিটে। টাসমানিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করেছিলেন ৫০ মিনিটে। এই ভাবেই নিজের প্রতিভার দীপ্তিতে চমকে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়াকেও। ১৯৩৩ সালে আবার তিনি এসেছিলেন ইংলণ্ড সফরে। পুনরাবির্ভাবেও ইংলণ্ডকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন তিনি।

জীবনে খুব অল্পই টেস্ট খেলেছেন তিনি—মাত্র ১৮টি। ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৩টি, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫টি। এত অল্প টেস্ট খেললেও রান কিন্তু কিছু কম করেন নি। ১৮টি টেস্টে রান করেছেন ২৬৪১, উইকেট পেয়েছিলেন ৫৯টি, কিন্তু এ দিয়ে তাঁর যোগ্যতা-বিচার মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি কি ধরনের ক্রিকেটার ছিলেন যাঁরা তাঁকে দেখেছেন একমাত্র তাঁরাই বলতে পারবেন। জীবনের শেষ টেস্ট যখন খেলতে নামেন তখন তাঁর বয়স ৩৭ বছর। সেটা ১৯৩৯ সাল। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জীবনের এই শেষ টেস্টেও তিনি স্বমূর্তি ধরেছিলেন। মারমুখী আক্রমণে ইংলণ্ডের বোলিংকে চুরমার করে দিয়ে ৯৮ রান করেছিলেন ৭৮ মিনিটে, আর বোলিংএ ৭৫ রানে ৫টি উইকেট নিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে স্মরণীয় তাঁর এই শেষ টেস্ট।

নিকোলাস ছিলেন এমন একজন ক্রিকেটার যিনি কোনোদিন কেতাবী ক্রিকেটের ধার ধারতেন না। ব্যাট হাতে উইকেটে দাঁড়িয়ে, দেখে শুনে বল মারা তাঁর ধাতে সইত না। উইকেটে এসে দাঁড়াতেন আর শুরু করতেন পেটানো। পিটিয়ে বল ছাতু করতেই তিনি বেশী আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতে ছিল, "ব্যাটের ধর্মই হল বল পেটানো।"

'ক্রিকেট ইন দি সান' নামে তাঁর আত্মচরিত গ্রন্থে নিকোলাস এই কথাই বলেছেন।

এমন একজন খেলোয়াড়, মাঠের ভিতরে যিনি শুধুই একজন ক্রিকেটার, নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সদা জাগ্রত ও সচেতন; মাঠের বাইরে ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, সদা হাস্যময় অমায়িক এক পুরুষ। তাই বর্ণবিদ্বেষের অন্ধ গোঁড়ামির যুগেও পেয়েছিলেন অসংখ্য সাদা চামড়ার বন্ধুত্ব। অসাধারণ ক্রিকেট প্রতিভা আর সুন্দর সাধু ব্যবহারের জন্যই একজন অশ্বেতকায় হয়েও নিকোলাস ইংলণ্ডের লর্ডস সভার সদস্য হতে পেরেছিলেন। সবাই ভালবাসত তাঁকে, ভালবাসত তাঁর ক্রিকেট প্রতিভাকে। অনন্যসাধারণ ক্রিকেট-প্রতিভা দিয়ে যে নিকোলাস একদিন সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিলেন, ক্রিকেট ইতিহাসে এক বরণীয় মানুষরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ৬৯ বছর বয়সে ১৯৭১ সালের ১লা জুলাই লণ্ডনে তিনি দেহ রেখেছেন।

হ্যাঁ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেই যুগন্ধর টেস্ট ক্রিকেটার লড লিয়ারী নিকোলাস কনস্ট্যানটাইনের গল্পই তোমাদের বলছিলাম এতক্ষণ।

● বুদ্ধির খেলা

এইখানে পাঁচটা টাকা আছে। পাঁচটা টাকা বা আধুলি নিয়ে এমন ভাবে সাজাতে পার যে পাঁচটা হেড ও পাঁচটা টেল দেখা যাবে।

না পারলে ৬৩৮ পৃষ্ঠা দেখ। ছবি আছে।

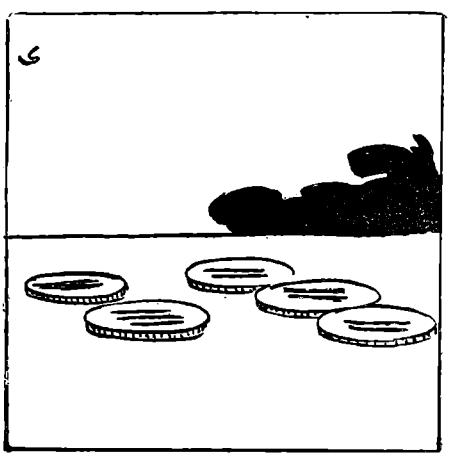

জীবন্ত তের জাদুঘর

[আর্থার পোর্জেস-এর "দ্য রুম"-অবলম্বনে]

শ্রীবৈজ্ঞানিক

সৌরজগতের দূরতম গ্রহ প্লুটো। তারও কক্ষপথের ওপারে।

মহাশূন্যচর "ইল্‌কর" সবে প্রবেশ করেছে আন্তর্নক্ষত্র ব্যোমমার্গে। ভীতত্রস্ত এক বৈমানিক নায়ক এসে কমাণ্ডারের সমুখে দাঁড়ালেন—

"মালিক! একটা দুঃসংবাদ না জানালে নয়। জনৈক তত্ত্বাবধায়কের অবহেলায় একটা রুম রয়ে গিয়েছে তৃতীয় গ্রহে। তার দেহের ভিতরকার যন্ত্রপাতি সবসমেতই।"

কমাণ্ডারের ত্রিকোণ চোখ দুটো বুজে গেল এক মুহূর্তের জন্য। তারপরই তা খুলল আবার। কণ্ঠ থেকে স্বর যা বেরুলো, তাতে উত্তেজনার কোন আভাস নেই।

"রুমটার বিবরণ?"

"এইচ-৯ জাতীয়। একশো ষাট পাউণ্ড প্লাস, পনেরো মাইনাস। গতিবৃত্তের সর্বাধিক ব্যাসার্ধ ত্রিশ মাইল।"

কয়েক মিনিট সাড়া নেই কমাণ্ডারের। তারপর তিনি বলছেন—"এখন ত ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কয়েক হপ্তা পরে ওদিকে আবার যাব যখন, রুমটাকে তুলে নেব। হারালে চলবে না। অত্যন্ত দামী যন্ত্র, শক্তির সীমা নেই, আর সে-শক্তি বাইরে থেকে আমদানি করারও দরকার নেই, দেহের ভিতরেই তৈরী হচ্ছে চাহিদা মত। না, অমন মূল্যবান জিনিস হারাতে পারি না।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন—"দোষী লোকটাকে কঠিন সাজা দিতে চাও"—কথা যেন তরোয়ালের মত ধারালো।

কিন্তু ইল্‌কর আর তৃতীয় গ্রহে ফিরতে পারেনি। "রিগেল" নক্ষত্রপুঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছোতেই এক বোম্বেটে বিমানের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তার চ্যাপটা গড়ন, আংটির আকার। দুই পক্ষই শুরু করল আগুন ছুঁড়তে। লড়াইয়ের শেষে দু'খানা বিমানেরই অবস্থা শোচনীয়। কাঠামো আধাআধি গলে গিয়েছে, দুটো ধাতুপিণ্ডই তেজস্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন। কয়েক ডজন মৃতদেহ জঠরে নিয়ে রিগেল-পুঞ্জের চারপাশে তারা দুটোই পাক খেতে থাকল অনন্তকাল ধরে। কক্ষপথটা ছোট নয়, একবার ঘুরে আসতেই লাগে লক্ষ কোটি বছর।

ওদের হিসাবে যেটা তৃতীয় গ্রহ ছিল, আমরা যাকে বলি পৃথিবী, সেখানে তখন চলছে সরীসৃপ-যুগ।

সে-যুগ পালটালো। কত কত লক্ষ লক্ষ যুগ এল আর গেল। তারপর একদিন দুজন মানুষ এসে নামল কানাডার রকিপর্বতের এক বিজন উপত্যকায়। ছোট্ট একখানা সী-প্লেনে চড়ে তারা এসেছে। মালগুলো সব নামিয়ে দিয়ে ওয়াল্ট লেনার্ড আবার চড়ে বসল বিমানে। বিমান উঠে যাচ্ছে আকাশে, নীচে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে জিম আরউইন—

"আমার চিঠিখানা পাঠিয়ে দিস ভাই বাড়িতে, ভুলিস না—"

"মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে ডাকে ফেলব"—চেঁচিয়ে জবাব দিল ওয়াল্ট, ইঞ্জিনের মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—"ইউরেনিয়াম কিন্তু পাওয়াই চাই। আর দেখিস—ভালুক থেকে হুঁশিয়ার—রকি পর্বতের ভালুক বড় ভয়ানক—"

সী-প্লেন উড়ে চলে গেল, পিছনে ধোঁয়ার লেজুড় রয়ে গেল ফেনার মত সাদা। সে লেজুড়ও মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জিম আরউইন ধীরে ধীরে টোকা দিচ্ছে নিজের নাকে। গা সিরসির করছে তার। এই রকি পর্বতে তিন হপ্তা একা থাকবে সে, একেবারে একা। বিমানটা যদি ফিরতে না পারে কোন কারণে, মৃত্যু তার নিশ্চিত।

লোকালয় এখান থেকে শত শত মাইল দূরে। পাহাড় আর বন, বন আর পাহাড়। এই গোটা অঞ্চলটাই বনে পাহাড়ে ভর্তি। পাহাড়ে চিরতুষার। জঙ্গল এত নিবিড়, সৃষ্টির শুরু থেকে তার ভিতর মানুষের পা পড়েনি কোনদিন। যথেষ্ট খাবার সঙ্গে নিয়েও যদি কেউ বহির্জগতের দিকে রওনা হয়, তারও কোন আশা নেই পথের শেষে পৌঁছোবার। এদিকে ত জিম আরউইনের জন্য যা খাদ্য রেখে গেল ওয়াল্ট, তাতে টেনেটুনে ঐ তিন হপ্তাই চলবে হয়ত। তার বেশী আর না।

কিন্তু কেন এসব চিন্তা? ওয়াল্ট আসবেই, নির্দিষ্ট দিনেই আসবে। ও-চিন্তা ছেড়ে দিয়ে জিমের এখন কাজে নেমে পড়া দরকার। ইউরেনিয়াম খোঁজার কাজ। যদি পেয়ে যায়, দেদার পয়সা রোজগার হবে কমিশন হিসাবে, কোম্পানি দেবে। পয়সার লোভেই সে রাজী হয়েছে এই বিপজ্জনক কাজে। স্ত্রী আসতে দিতে চায় নি। কোন রকমে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে এসেছে। দারিদ্র্যের বড় জ্বালা। হয়ত ঘুচতে পারে সে জ্বালা চিরদিনের জন্য, এই আশায় বুক বেঁধে সে এসেছে রকি পর্বতে। সেই আশাতেই বুক বেঁধে তার স্ত্রী-পুত্র বসে আছে সুদূর পল্লীগৃহে, তার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়। ভগবান করুন—সে প্রতীক্ষা যেন ব্যর্থ না হয়।

পাকা বনচরেরা কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে না। নজর রাখে যাতে তোড়জোড়ের

—

প্রত্যেকটা কাজ হয় নিখুঁত। খুঁত থাকলে অনর্থ ঘটবেই। আর লোকালয়ে যে অনর্থকে লঘু করে দেখা সম্ভব হতে পারে, বনাঞ্চলে তাই হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক।

পাহাড়ের গায়ে ঠেকনো দিয়ে একটা চালা প্রথমেই তুলে ফেলল জিম। কালটা গরমের, থাকতে হবে মাত্র তিন হপ্তা। এর জন্য ওর চেয়ে পাকা বন্দোবস্ত কিছু দরকার নেই। জিনিসপত্র সব এনে চালার তলায় রাখছে জিম। সকাল বেলায়ই রোদ এমন প্রখর যে এরই মধ্যে সে ঘর্মাক্ত কলেবর। সব মাল সাজানো হয়ে গেলে ত্রিপল চাপা দিল তার উপরে। বৃষ্টি যদি হয়, ত্রিপলেই তা আটকাবে। তা ছাড়া জন্তু-জানোয়ার যদি এসে পড়ে, খাবারগুলো হাটকাতে চায়, তারাও বাধা পাবে ঐ ত্রিপলেই।

সব জিনিসই চালার তলায়, একটি ছাড়া। সে জিনিস হল ডিনামাইট। সেটা মাটির তলায় পুঁতে রাখল আন্দাজ শো-দুই গজ দূরে। তাও ত্রিপল-জড়ানো, যাতে ভিজে না ওঠে। নিজের শোবার ঘরে যারা উগ্র বিস্ফোরক রাখে, তারা নীরেট বোকা।

প্রথম দুটো হপ্তা কোন্‌দিক দিয়ে কেটে গেল, জিম তা টেরও পেল না। খেটেছে উদয়াস্ত, উৎসাহিত হয়ে ওঠার মত কোন কিছু আবিষ্কার করতে পারে নি। একটা মাত্র দিক এখন দেখতে বাকী আছে, সেটাতে তল্লাশী চালাবার পক্ষে হাতের এই একটা হপ্তাই পর্যাপ্ত বইকি। তৃতীয় হপ্তার গোড়াতেই এক সকালে সে রওনা হল সেইদিক লক্ষ্য করে। উপত্যকাটার উত্তর-পুব কোণ। এদিক পানে একদিনও আসা হয় নি আগে।

সাজসরঞ্জাম সবই সে সঙ্গে নিয়েছে। ইস্তক ইয়ার ফোন পর্যন্ত। আপাততঃ সেটা উলটো করে লটকে রেখেছে কানে, যাতে ওর চিরন্তন সাঁ সাঁ আওয়াজে স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি ঘুলিয়ে যেতে না পারে। হাতে রাইফেল, অসম্ভব ভারী। এটা ঘাড়ে নিয়ে কোন মেহনতের কাজে বেরুনো ঝকমারি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু কানাডার ভালুক ভয়ানক চীজ। এ উপত্যকায় তাদের দেখা মিলতে পারে যে কোন মুহূর্তেই। যা-তা অস্ত্র নিয়ে তাদের মোকাবিলা করা অসম্ভব। এই ৩০-০৬ রাইফেলও অনেক সময় হার মেনে যায় ওদের কাছে।

এ যাবৎ দু দুটো ভালুক মেরেছে জিম। মেরে খুশী হয়নি। কারণ সত্যিকার দেখবার মত জন্তুই বটে ওরা। আর সংখ্যাও ওদের দিনদিনই কমে আসছে। ভবিষ্যতে আর না মারতে হলে বেঁচেই যায় জিম। তবে রাইফেল, না মারতে হলেও উপকারে আসে। যে ভালুক একবার রাইফেল থেকে গুলি ছুটতে দেখেছে, সে প্রায়ই ভবিষ্যতে রাইফেলওয়ালাদের এড়িয়ে চলে।

রাইফেল রয়েছে, কাজেই পিস্তল নেওয়ার আর দরকার নেই। ওটা চালার ভিতরই রেখে গেল জিম।

যে কাজে এসেছিল, তার কিছুই এ-যাবৎ করতে পারেনি। সেদিক দিয়ে তার মনটা খারাপ থাকারই কথা ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল পথ চলতে চলতে সে মনের আনন্দে শিস দিচ্ছে। হাওয়া নির্মল। তুষারের ছোঁয়াচ লাগার দরুন অল্প ঠাণ্ডা। পাহাড়ের মাথায় বারমেসে বরফে নীলচে-সাদা রং, তার উপরে আবার দীপ্ত রৌদ্রের ঝলমলানি। পৃথিবী, আকাশ, উপত্যকা, উপবন সব জোড়া এক মন-মাতানো বাসন্তী সুবাস। মানুষের মনের সাধ্য কি যে উৎফুল্ল না হয়ে পারে?

জিমের মতলব—পুরো একটা দিন সে ক্রমাগত পথ চলবে উত্তর-পুবে। যেখানে, পৌঁছবে, তন্নতন্ন করে খুঁজবে সেই অঞ্চলটা। এ কাজে সে পুরো দেড় দিন সময় দিতে পারে এখনো। তারপর অবশ্য ফিরতেই হবে তাকে, কারণ ওয়াল্ট লেনার্ডের ফিরে আসার সময় হয়ে যাবে ততদিনে।

বিপদ-আপদের কথা বলা যায় না। অজানা পথে চলতে হলে কিছু-না-কিছু খাদ্য সঙ্গে রাখতেই হয়। জিমের সঙ্গেও সেই ব্যবস্থাটুকুই আছে শুধু। ওটা হল শেষের সম্বল। ওতে হাত দেবার দরকার এক্ষেত্রে হবে না বলেই জিমের আশা। দিনের-দিন খাবার সে সদ্য-সদ্য জুটিয়ে নেবে। একটা খরগোশ মেরে, লতাপাতার আগুনে ঝলসে নেওয়া ত শক্ত নয় কিছু। আর ছোট ছোট নদী ত অগুন্তি! মাঝে মাঝে রামধনুর রং ঝলকাচ্ছে তাদের জলে।

সারা সকাল হেঁটেই চলল জিম। সঙ্গে গেইগার কাউণ্টার আছে। কোথাও খনিজ পদার্থের শিরা থাকলে সে-যন্ত্রে টুংটাং আওয়াজ শুরু হবে। এযাবৎ দুই-চারবার হয়েছেও সেরকম আওয়াজ, কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য। অর্থাৎ শিরা এখনও পুষ্টিলাভ করেনি, বা শিরা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। পরিপুষ্ট শিরার কাছে এলে কাউণ্টার ক্রমাগত বাজতেই থাকত, আর সেই ক্ষেত্রেই পরীক্ষা করে দেখার দরকার হত যে খনিজটা ইউরেনিয়াম না অন্য-কিছু।

না, মনের আনন্দ উবে যাচ্ছে। ইউরেনিয়াম না পেলেই যে নয়! পয়সার যে বড় দরকার! স্ত্রী পথ চেয়ে বসে আছে। তাকে শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হবে? ওঃ!

কিন্তু রকি পর্বতের বিজন উপত্যকায় ঘুরতে ঘুরতে হতাশাকে বেশী আমল দেওয়া নিরাপদ নয়। খিদে পেলে খেতে হবে। পথ চলবার সময় হুঁশিয়ার থাকতে হবে। দুই মিনিট বসে বিশ্রাম নিতে হলেও স্থানটা পরখ করে নিতে হবে সাবধানে।

হতাশায় মুষড়ে পড়ার স্থান-কাল এটা নয়। ভবিষ্যৎ যতই অন্ধকার হোক, বর্তমানে হাত-পা এলিয়ে দিলে চলবে না। এখন খিদে পেয়েছে, খাওয়ার চেষ্টা দেখতে হবে। সমুখে ঐ ছোট নদী, মাছ ধরা যাক একটা। ঝোলা থেকে ছিপের টুকরোগুলো

বার করে জোড়া দিতে বসল জিম। বসল একটা ঘাসে-ঢাকা নীচু পাথরের উপরে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল একবার। জায়গাটা বসবার পক্ষে নিরাপদ ত?

আর নিরাপদ! পিছন দিকে চোখ ফেরাতেই বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল তার। চোয়াল দুটো ঝুলে পড়ল দারুণ বিভীষিকায়। এ কি কোন দানবের কসাইখানা নাকি? নানারকমের জন্তুর ধড়! সমান্তরাল তিন সারিতে পর পর সাজানো। যতদূর দৃষ্টি চলে, সেই তিন সারি সোজা চলে গিয়েছে ঝোপঝাড়, বনবাদাড়ের বুক চিরে।

কত রকমের যে জন্তু! কাছাকাছি যেগুলো রয়েছে, তাদের বরং চেনা যায়—হরিণ, ভালুক, কাউগার, পাহাড়িয়া ভেড়া—এই সব। কিন্তু ওদিকটাতে? জবড়জং সব জানোয়ার, লম্বা লম্বা চুল সারা গায়ে, গড়নে সংগতি নেই, পূর্ণতা নেই, দেহগুলোকে বিশেষ কোন ঢং দেবার কথা যেন বিধাতা পুরুষের মনেই পড়ে নি।

তাদেরও ওদিকে? সারি সারি সরীসৃপের দেহ, এমন এমন বীভৎস সব আকৃতি, দম-আটকানো দুঃস্বপ্নেও যা কেউ দেখে নি কখনো। এদেরই একটা, লাইনের প্রায় শেষ মাথায়, বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করল জিমের। চেহারাটা চেনা। ঠিক এই জন্তুই সে মিউজিয়ামে দেখেছে। তবে এর চেয়ে ঢের বড়। বড়, তবে হাতে বানানো। মাটির তলায় কয়েক লক্ষ বছরের পুরোনো একটা অসম্পূর্ণ কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছিলেন পণ্ডিতেরা। তুলে এনে তারই অবলম্বনে গড়ে তুলেছেন প্রাচীন পৃথিবীর সেই বিস্মৃত স্টেগোসাউরাস। মিউজিয়ামের সেই হাতে-গড়া মূর্তিটা ছিল বৃহৎ, জিমের সমুখে যেটা রয়েছে, নিজস্ব রক্তমাংসে যা এখনও সজীব বলেই মনে হয়, তার আকার একটা টাটু ঘোড়ার চেয়ে বড় নয়।

প্রায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে জিম হেঁটে চলেছে, দুই লাইন ধড়ের মাঝখান দিয়ে। কী বিরাট প্রদর্শনী! কত জাতের জীব! কত কত যুগের জীব! ময়লা হলদে রঙ একটা বিশাল সরীসৃপ, গায়ে তার সাপের মত আঁইশ, তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই আরও যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল জিম। প্রাণীটার এক চোখের পাতা যে নড়ছে!

ব্যাপারখানা আসলে কী, এইবার মাথায় এসেছে জিমের। আঁধারে যে তথ্য ছিল আচ্ছন্ন, তা বিদ্যুৎ চমকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই জীবগুলো একটাও মরেনি। পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। কে জানে কত যুগ যুগ ধরে। নিশ্চয়ই যুগ যুগ আগেকার জীব এরা। ঐ স্টেগোসাউরাসের কথাই ধর না কেন! কত লক্ষ বছর আগে ওরা পৃথিবীতে বিচরণ করত, হিসাব করতে গেলে মহামহা পণ্ডিতেরও মাথা গুলিয়ে যাবে।

কে সে অনুসন্ধিৎসু সমজদার, যে সৃষ্টির শুরু থেকে প্রতি যুগের প্রতি স্তরের প্রাণী, স্থলচর, জলচর, উভচর, বায়ুচর পশু পক্ষী সরীসৃপ—প্রতি জাতির এক একটা সজীব

জিম কাঁধ থেকে নামিয়ে নিল রাইফেল। [পৃষ্ঠা ৬৩৫

নমুনা সংগ্রহ করে সযত্নে রক্ষা করেছে এই অভাবনীয় জাদুঘরে? ধরেছে জ্যান্ত অবস্থায়, মানুষের অজানা কোন বৈজ্ঞানিক কৌশলে দেহগুলোকে নিঃসাড় করে রেখেও তার ভিতরে প্রাণটাকে ধরে রেখেছে অবিনশ্বর করে? অবিনশ্বর যে, তার প্রমাণ ত ঐ নোংরা হলদে সরীসৃপটা? লক্ষ বছরের পুরোনো দেহে এখনও চোখের পাতা নড়ছে!

কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে জিমের দরদর ধারায়। স্টেগোসাউরাসেরা যখন চরে বেড়াত এই উপত্যকায়, সে আজ কত দিনের কথা?

আরও এক অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়েছে জিমের। সারিবদ্ধ প্রাণিগুলো আকারে আয়তনে প্রায় সবাই সমান। অতিরিক্ত বড় প্রাণী একটাও না। সেগুলোকে যেন ইচ্ছে করে বাদ দেওয়া হয়েছে? ধর যেমন অতিকায় টাইর‍্যানোসাউরাস। নেই একটাও এখানে। ধর ম্যামথ, তাও নেই। কেন নেই? যে দানবের রচনা এই পিলে চমকানো প্রদর্শনী, সে কি বৃহৎ জন্তু ধরতে অপারগ ছিল?

ভাবতে শুরু করেছিল জিম, কিন্তু বেশী ভাববার সময় পেলো না। পিছনে ঝোপঝাড়ে সড়সড় শব্দ শুনেই সে সাবধান হয়ে গেল।

এক সময়ে পারদ নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল জিমকে, কোন একটা কারখানায়। আজ এক সেকেণ্ডের জন্যে তার মনে হল—গলানো পারার আদ্ধেক ভর্তি একটা চামড়ার বস্তা যেন গড়াতে গড়াতে ফাঁকা জায়গাটায় এসে ঢুকছে। গোলমাল ঐ বস্তুটার গতি সেই রকমই। যে জিনিস একাধারে পাতলা আর ভারী, তাকে গড়িয়ে দিলে সে ত ঐভাবেই চলবে!

কিন্তু, চামড়ার বস্তা? উঁহু, চামড়াও নয়। কী ও তাহলে?

গায়ে ওর ডজন ডজন আব। অন্ততঃ প্রথম নজরে আব বলেই জিমের মনে

হয়েছিল ঐ ফুলো ফুলো জায়গাগুলোকে। একটু ভাল করে দেখতেই এখন বুঝতে পারল—আব নয়, ধড়ের ভিতরকার কোন অজানা কলকবজা ঠেলে বেরুতে চাইছে ঐ স্ফীতিগুলোর তলা থেকে।

কিন্তু জিনিসটা যে সত্যি সত্যি কি, তা পর্যবেক্ষণের জন্য ওখানে ত আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। কারণ ঐ গোলকটা গড়াতে গড়াতে তেড়ে আসছে তার দিকে। আসছে, ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ মাইল বেগে। আসতে আসতে হাতিয়ার বার করছে নানারকম। ঐ আবগুলো থেকেই বেরুচ্ছে হাতিয়ার। একবার বেরুচ্ছে একবার ঢুকে যাচ্ছে ধড়ে, আবারও বেরুচ্ছে—ঠিক যেন ধাতুময় বল্লম এক প্রস্থ, তবে বল্লমের মত সূঁচোলো নয়, এদের ডগায় পেঁয়াজের মত আকারের পরকলা।

জিমের সন্দেহ নেই যে ঐ বল্লমধারী গোলকের মতলবটি সাধু। ঐ যে নানাযুগের বিবিধ জাতের প্রাণী জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি পর্যায়ে স্থির হয়ে রয়েছে লাইন বেঁধে, ঐ লাইনের শেষ সংগ্রহ হিসাবে জিমকে অনন্তকালের জন্য স্থিতু করাই উদ্দেশ্য তার। সেই জন্যই এই পশ্চাদ্ধাবন।

একটা অর্থহীন অর্ধোক্তি জিমের মুখ থেকে ঠিকরে বেরুলো। তারপর একদৌড়ে পিছিয়ে এল অনেকখানি। কাঁধ থেকে নামিয়ে নিল রাইফেল। ঐ গোলকটা আন্দাজ ত্রিশ গজ পিছনে রয়েছে। গতিবেগ খুব দ্রুত নয় ওর, কিন্তু সে-বেগ এক সেকেণ্ডের জন্যও হ্রাস পাচ্ছে না একটুও। একভাবে এক নাগাড়ে এই দৌড়, এ যেন ক্রুদ্ধ গণ্ডারের দ্রুত ধাবনের চেয়েও ভয়াবহ।

জিম অভ্যস্ত ক্ষিপ্রহস্তে কার্তুজ পুরে ফেলল রাইফেলের নলীতে। কুঁদোটা গালের সঙ্গে ঠেকিয়ে চামড়া-ঢাকা গোলকটার দিকে তাক করল। ফসকাবার কোন উপায় নেই। দুপুর-রোদের ভিতর অতবড় লক্ষ্যবস্তুটা মাত্র কুড়ি গজ তফাতে। ঘোড়া টিপতে গিয়ে জিমের মুখে ফুটে উঠল হিংস্র হাসি। এই ধাতু দিয়ে মোড়া ১৮০ গ্রেন পরিমাণ ছোট বুলেটগুলোর শক্তি তার জানা আছে। সাতাশ শো ফুট গতি ওর প্রতি সেকেণ্ডে। চোখের পলকে ঐ পিশাচ রূং ফুটো হয়ে দলা পাকিয়ে যাবে একটি বুলেটে।

রূং? কি জানি কেন জিমের মনে হল জিনিসটার নাম রূং হওয়াই উচিত। ভয়াবহ অথচ দুর্বোধ্য বস্তুর ঐরকম আজগুবি নামকরণ মানুষ খেয়ালবশেই করে থাকে।

হোয়াম! কাঁধে লাগল ধাক্কা, যেমন লেগে থাকে। ঈ-ঈ-ঈ-ঈ—

এ কী? বুলেট ঠিকরে ফিরে এসেছে একটা নাকী-সুরের চিৎকার তুলে! জিম আঁক করে নিশ্বাসটা গিলে ফেলল। এ কী? মাত্র বিশ গজ দূর থেকে? রূংয়ের গায়ে লেগে রাইফেলের বুলেট ফিরে এসেছে। যেমন আসে ট্যাঙ্ক-এর গায়ে প্রতিহত হলে?

উন্মাদের মত সে ক্রমাগত গুলি ছুঁড়তে লাগল। কিছুতেই কিছু হয় না। লাগে আর ঠিকরে পড়ে। রূং অব্যাহত গতিতে এগুচ্ছে। মাত্র ছয় ফুট দূরে রয়েছে ওটা। এইবার জিমের খেয়াল হল—রূং তার আবের তলা থেকে বার করেছে আঁকশিমুখো ঝিকমিকে আঙ্গুল কয়েকটা, সেই সব আঙ্গুলে উঠোনো রয়েছে পিচকারির মত এক ফাঁপা নল, তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা চুইয়ে পড়ছে সবুজ একটা তরল পদার্থ।

জিম পিছন ফিরে দৌড়োলো তীরবেগে।

মানুষটা তেমন মোটাসোটা নয়, দৌড়োনো তার অভ্যাসও আছে। রূংকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া সহজ তার পক্ষে। রূং অত জোরে দৌড়োতে পারবে না। পারলে কি আর দৌড়োতো না? ওর গতিবেগ সীমাবদ্ধ।

কিন্তু, হোক না সীমাবদ্ধ! না পারুক বেগ বাড়াতে! তাতেও কি ওর শিকারের নিস্তার আছে? রূং যদি সারাদিন ঐ পাঁচ মাইল বেগেই দৌড়োতে থাকে, তার যান্ত্রিক দেহে ক্লান্তি আসবে না। ওদিকে যে জীব তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে? সে কতক্ষণ একটানা দৌড়োতে পারবে? সে ত দু'ঘণ্টা দৌড়োলেই নেতিয়ে পড়বে অবসাদে!

জিম দৌড়োচ্ছে তার ফেলে-আসা আস্তানার দিকে। সেখানে তার মালপত্র আছে বলেই নয়, ওয়াল্ট লেনার্ড সী-প্লেন নিয়ে নামবে সেইখানেই। তাছাড়া, এক গাদা ডিনামাইট রয়েছে সেখানে। রাইফেল ব্যর্থ হয়েছে, এখন ডিনামাইটে ওড়ানো যায় কি না এই দুশমনকে, সেটার পরীক্ষা হতে পারে, সেই নির্দিষ্ট জায়গাটাতে পৌঁছোতে পারলেই।

দৌড়োচ্ছে জিম, আর একটা একটা করে ভারী জিনিস ফেলে যাচ্ছে পথে। গেল খাবারের ঝোলা, গেল বস্ত্রপাতি, তারপর গায়ের কোট, পায়ের বুট। দিনটা গরম, তায় দৌড়ের দরুন দেহ আরও গরম হয়েছে। জামা, জুতোর অভাবে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে মারা পড়তে হবে না। আর রূংয়ের জাদুঘরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে ঠাণ্ডা লেগে মরাও কি ভাল নয়?

ভারী জিনিস একমাত্র রয়েছে রাইফেলটা। এটাও কি ফেলে দিতে হবে? নিরুপায় না হলে নয়। সমুখে একটা খাড়া টিলা পেয়ে আঁচড়-পাঁচড় কেটে তার মাথায় চড়ে বসল জিম। রূংও এসে দাঁড়িয়েছে সেই টিলার নীচে। জিম অনেকখানি নিশ্চিন্ত। ঐ আধা ভরতি বস্তার মত থলথলে দেহ নিয়ে রূং কি আর পাহাড়ে উঠতে পারবে?

না, তা পারল না, কিন্তু হাত বার করল তিনখানা। ধাতুর হাত, মাথায় আঁকশির মত নখ। এক একটা বাঁশের মত লম্বা। তা দিয়ে অনায়াসে টিলার মাথা নাগালে

পাবে। উঠে আসছে সেই তিনখানা হাত। জিম দিল লাফ উলটো দিক দিয়ে। লাফিয়ে পড়ল টিলার মাথা থেকে সমতলে। মরে যেতে পারত, কিন্তু রূংয়ের জাদুঘরে আশ্রয় নেওয়ার চাইতে মরা মন্দ কী? পড়েছিল ঝোপের উপরে, চোটও বেশী লাগেনি।

উঠে আসছে তিনখানা হাত।

তিনখানা ধাতুর হাত গুটিয়ে নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করতে খানিকটা সময় লাগল রূংয়ের। ইতিমধ্যে জিম এগিয়ে গিয়েছে খানিকটা। টিলার মাথায় বিশ্রামও পেয়েছে মিনিট দশেক। আবার কিছুক্ষণ ও যুঝতে পারবে।

আগের দিন ঘণ্টা দশেক সে হেঁটেছিল, মাইল ত্রিশ-বত্রিশ। আজ সেই দূরত্বটাই সে ছুটে পেরিয়ে এল ছয় ঘণ্টায়। নিজের আস্তানায় যখন পৌঁছোলো হাঁপাতে হাঁপাতে, তখন রূংও কিন্তু সামান্য কয়েক মিনিটের পথ পিছনে রয়েছে। তাও থাকত না পিছনে, যদি না এক অতিকায় ভালুক এসে রূংয়ের পথ আটকাত।

আটকাল কয়েক মিনিটের জন্যই। একখানা প্রকাণ্ড খাঁড়া বেরিয়ে এল রূংয়ের আবের ভিতর থেকে, আর ভালুকের গলাটা চিরে ফেলল একটি কোপে। তারপর সে আবার অনুসরণ করল জিমের।

এই ফাঁকে জিম তার ডিনামাইট এনে সাজিয়ে ফেলেছে পথের উপরে। বরাবর জিম লক্ষ্য করছে যে ওরই পায়ের দাগ অনুসরণ করে করে রূংটা অনুসরণ করছে ওর। কাজেই—

যে পথে ও নিজে এসেছে, সেই পথের উপরে ডিনামাইট সাজিয়ে রাখলে, রূংও নিশ্চয় সেই ডিনামাইটের উপর দিয়ে হাঁটবে। রূংয়ের ওখানে পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগবে, একটা হিসাব করে নিল ও। তারপর ডিনামাইটে পলতে লাগিয়ে দৌড়ে চলে গেল দূরে।

একটা শব্দ যেন কোথা থেকে কানে আসছে জিমের। কিন্তু এমন সময় নেই, যে চারিদিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করবে, যে শব্দটা কিসের বা কোথা থেকে আসছে। একবার মনে হল, তারই মাথার ভিতর থেকে বেরুচ্ছে ওটা। মাথা ঘুরছে, টলছে,

ফেটে যেতে চাইছে—উত্তেজনায়, পরিশ্রমে, নৈরাশ্যে। ডিনামাইটেও যদি না মরে রুং? রাইফেলে মরেনি, রকি পর্বতের রাজা-ভালুক ওর কিছু করতে পারেনি। ডিনামাইটও যে ব্যর্থ হবে না ঐ অমর যন্ত্রদানবের বেলায়, তা কে বলতে পারে?

ডিনামাইটের গাদার উপরে উঠেছে রুং। জিমও পলতেয় আগুন দিল। আর প্রলয় নির্ঘোষে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ হল যেই, সেই আওয়াজে ওরও মাথার ভিতরে একটা বিস্ফোরণ হয়ে গেল যেন। জিম উলটে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

না মরেনি জিম, মাথার শিরা ছিঁড়েও না, রুংয়ের কবলে পড়েও না। সে বেঁচে গেল। কারণ সোঁ সোঁ শব্দ যেটা একটু আগে হচ্ছিল সেটা সী-প্লেনের। ওয়াল্ট ফিরে এসেছে।

জিমের যখন জ্ঞান হল, তখন তাকে নিয়ে সী-প্লেন আকাশে উড়ছে। আস্তানা ছেড়ে যায়নি অবশ্য, রুংকে ঐ দেখা যায়, মামুলী পাঁচ মাইল বেগে ও ফিরে চলেছে ওর জাদুঘরে।

"মরেনি ডিনামাইটেও?"—ক্রুদ্ধ জিম আরউইনের প্রথম জিজ্ঞাসা।

"না, মরেনি"—বলল, ওয়াল্ট। "কিন্তু কি ওটা? ব্যাপার কি?"

জিম সব বলল। ওয়াল্ট একটু ভেবে, হেসে বলল—"ইউরেনিয়াম না পেয়ে থাকি, নেই? রোজগারের পথ খুলে গেছে। রুং অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা সময় নেবে তার জাদুঘরে ফিরতে। আমাদের লাগবে চার মিনিট। কাজেই ওর সংগ্রহ থেকে এই বেলা বেছে বেছে গোটা কতক লক্ষ বছর আগেকার জীবন্মৃত জীবকে যদি আমরা প্লেনে তুলে ফেলি, তাদের দাম বাবদ সভ্য জগতের যে-কোন মিউজিয়াম পঞ্চাশ হাজার ডলার আমাদের গুনে দেবে।"

---

৬২৮ পৃষ্ঠার ৬নং প্রশ্নের উত্তর

টাকাগুলি এইভাবে সাজালে তিনটা হেড ও তিনটা টেল দেখা যাবে।

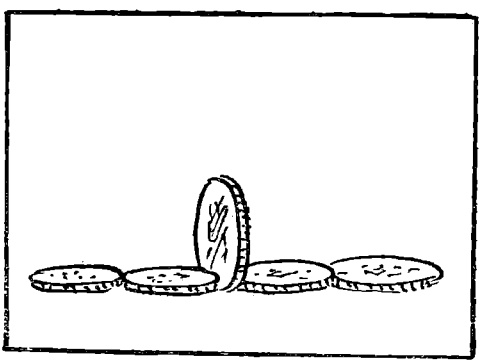

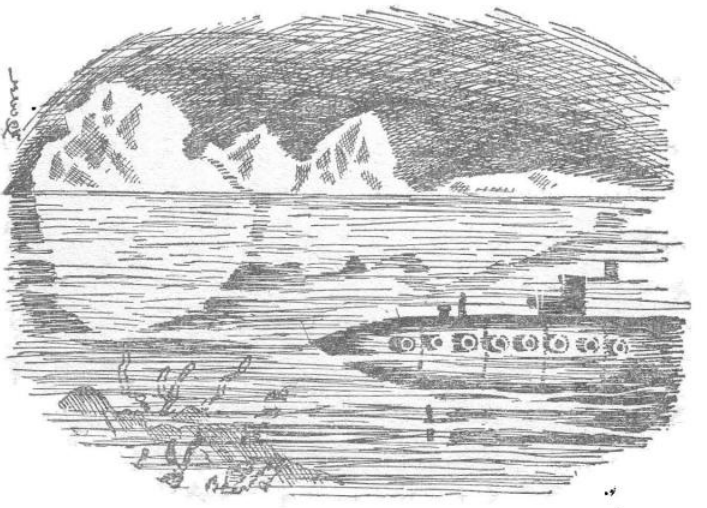

নটিলাস

সুনীলরঞ্জন দত্ত

জুলে ভার্নির একখানা বইও পড়েনি এমন পাঠকের সংখ্যা পৃথিবীতে নগণ্য। তাঁর সব রচনাই পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। তিনি তাঁর বইএ এমন সব কাল্পনিক বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলি পরবর্তী কালে মানুষ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে এমন অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে যা তিনি তাঁর বইএ অনেক আগেই উল্লেখ করেছেন। একখানা বইএ তিনি 'নটিলাস' নামে একটি সাবমেরিনের কথা বর্ণনা করেছেন। ঐ সাবমেরিনটি উত্তর মেরুতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল এবং বরফের নীচ দিয়ে একটি মেরুপথ আবিষ্কার করেছিল। এ সবই ছিল জুলে ভার্নির মনগড়া কাহিনী। অথচ তিনি এমন সময় ঐ সব বিষয়বস্তুর কথা কল্পনা করেছেন, যে সময় মানুষের পক্ষে উত্তর মেরুতে পৌঁছান ছিল একটি ভীষণ দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার তাঁর এই মনগড়া কাহিনীই একদিন বাস্তব রূপ পেল। নটিলাস নামে একটি সাবমেরিন সত্যি সত্যি একদিন উত্তর মেরুতে পৌঁছাল। তবে এই দুঃসাধ্য কাজটি সফল হয়েছে জুলে ভার্নির মৃত্যুর ৫৩ বছর পর।

উত্তর মেরু অভিযান শুরু হয়েছে ষোড়শ শতাব্দী থেকে অর্থাৎ জুলে ভার্নির জন্মের প্রায় ২৭৫ বছর পূর্ব থেকে। কিন্তু তখন পর্যন্ত মানুষ কেবল ব্যর্থতার বোঝা নিয়েই ফিরে এসেছে। যারা ফিরে আসতে পারেনি তারা পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

এমনি ধারা ব্যর্থতা চলেছিল বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত। ঐ সব অভিযানে জাহাজ, স্টিমার, প্লেন ছাড়াও চীনের টাট্টু ঘোড়া এবং এস্কিমোদের কুকুরে টানা স্লেজ, আইস ব্রেকারস, ক্যাটারপিলার, ট্রাক্টর প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছিল।

উত্তর মেরু আবিষ্কারের চিন্তা প্রথম মাথায় আসে একজন ইংরেজ অভিযাত্রীর। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিনখানা জাহাজ নিয়ে অভিযান শুরু করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সঙ্গী সাথী সহ তার বরফে জমে যাওয়া মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় এক রাশিয়ান ধীবর কর্তৃক ঠিক এক বছর পর। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ডাচ অভিযাত্রী দল 'স্পিটসবারগেন' (SPITZBERGEN) পর্যন্ত পৌঁছাবার পর কঠিন বরফের আঘাতে তাদের জাহাজের তলদেশ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইংরাজ এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন অস্ট্রিয়ান অভিযাত্রী উত্তর মেরু আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। তবে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে একজন অভিযাত্রী কিছুটা সফল হয়েছিলেন। তিনি মেরুদেশের উত্তরপূর্ব পথ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ঐ একই পথে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ের অভিযাত্রী অ্যামুণ্ডসেন প্রথম পেট্রোল ইঞ্জিন চালিত একটি জলযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। ঐ জলযানটি এখনও 'সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো'তে সাধারণের দর্শনের বস্তু হিসাবে রক্ষিত হয়েছে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার পেয়ারি (PEARY) নামে একজন অভিযাত্রী জাহাজে এবং পরে পায়ে হেঁটে প্রথম উত্তর মেরুতে পৌঁছাতে সক্ষম হল এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার একটি বিমান প্রথম উত্তর মেরুর উপর দিয়ে উড়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত জুলে ভার্নি বর্ণিত বরফের নীচ দিয়ে উত্তর মেরুতে পৌঁছান এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযোগ করার জন্য কোন মেরুপথ আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। তাই পৃথিবীর মানুষ ভেবেছিল জুলে ভার্নির স্বপ্ন বোধহয় আর সফল হবে না। কিন্তু ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্টের প্রায় মধ্য রাত্রে একটি সাবমেরিন বরফের নীচ দিয়ে উত্তর মেরুর ১ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেল। সাবমেরিনের রেডিওতে নাবিকদের উদ্দেশ্যে সাবমেরিনের কম্যাণ্ডারের ঘোষণা শোনা গেল—"আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমরা উত্তর মেরুতে পৌঁছে যাচ্ছি। জুলে ভার্নির দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন আজ বাস্তব রূপ নিতে চলেছে।

জুলে ভার্নির কাহিনী অনুযায়ী এই আধুনিক সাবমেরিনটির নামও রাখা হয়েছে 'নটিলাস'। তবে আধুনিক নটিলাসের ক্যাপ্টেন জুলে ভার্নি বর্ণিত 'নিমো' নয়—আমেরিকার অধিবাসী কম্যাণ্ডার 'অ্যাণ্ডারসন' পারমাণবিক শক্তি দ্বারা চালিত পৃথিবীর এই প্রথম সাবমেরিনটি আমেরিকা তৈরি করে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। উত্তর মেরু অভিযান কালে কম্যাণ্ডার অ্যাণ্ডারসন ৩০ ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে এই সাবমেরিনটিকে বরফের নীচ দিয়ে চালিয়েছেন। সমুদ্রের উপরিভাগ ছিল অসমতল বরফের দ্বারা আচ্ছাদিত।

'গাইরসকোপিক' (GYROSCOPIC) যন্ত্র তাঁদের নির্দিষ্ট পথের নিশানা দিচ্ছিল আর রেডার (RADAR) যন্ত্রে তারা বরফের বিভিন্ন স্থানের ঘনত্বের নির্দেশ পাচ্ছিল। ঘড়ির কাঁটা যখন রাত ১১—১৫ মি. সময়ের চিহ্নকে স্পর্শ করল নটিলাস তখন উত্তর মেরুতে পৌঁছাল। এর এক বছর পর ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ পারমাণবিক শক্তি দ্বারা চালিত আমেরিকার আর একটি সাবমেরিন উত্তর মেরুর বরফের আচ্ছাদন চূর্ণবিচূর্ণ করে মেরুদেশের মুক্ত আকাশে মাথা তুলেছিল। এখন তো সোভিয়েত দেশের 'লেনিন' নামে একটি 'আইস্ ব্রেকার' জাহাজ উত্তর মেরুতে নিয়মিত যাতায়াত করছে। 'লেনিন' জাহাজটিও পারমাণবিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত। জাহাজটি তৈরি করা হয় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রায় ৬ ফুট পুরু বরফ কেটে ২ নট্ গতিতে এগোতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জাহাজটির ডুবে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

এক সময় মানুষের কাছে যা ছিল কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ, নূতন ধরনের জাহাজ এবং সাবমেরিন তৈরীর ফলে আজ তা হয়েছে অনেক সহজসাধ্য। অথচ জুলে ভার্নির সময়ে এই ধরনের জাহাজ এবং সাবমেরিন তৈরীর কথা বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তাই করতে পারত না।

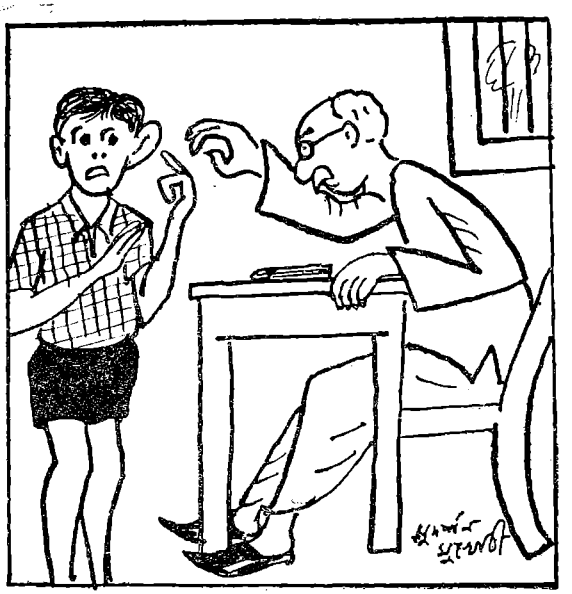

—আগে টেনে টেনে বাঁ কান লম্বা হয়ে গেছে স্যার! এবার ডান কান ধরুন।

পরদিন এরা আবার বেড়িয়েছে
বাঁচাও! বাঁচাও!

বাঁচাও! বাঁচাও!

এ্যাই মেয়েগুলো, তোরা হাঁ করে দেখছিস্ কি? শীগ্‌গির আমার সুতোর জটটা খুলে দে
তোমার এ দশা করলো কে?

বোকার মত প্রশ্ন করবে আবার কে! আমি মাছ ধরছিলাম, হঠাৎ আমার দাড়ির সঙ্গে সুতোটা জড়িয়ে যায়। খুলে দে আগে।

দুই বোনে সুখে খুলতে লেগে গেল
ওঃ, এমে কিছুতেই খুলতে পারছিনা
সোনা, এদিকে শুনে যাও একবার

আবার কাঁচিটা দিয়ে দাড়িটা কেটে দিলেইতো ঝামেলা চুকে যায়।
ঠিক বলেছ তুমি।

সোনা, কাঁচি দিয়ে অর্ধেকটা দাড়ি উড়িয়ে দিতেই।

বুড়ো ভীষণ রেগে যায়
অ্যাঁ! আমার দাড়ি! কেটে ফেলেছিস্? ছুঁচো কোথাকার!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

বাড়িটা পুরোনো। এ পাড়ার সব বাড়িই ত পুরোনো দেখছি। গেট ঠেলতেই সেটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল। ও ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। পায়ের জুতো জোড়াও মচমচ করছে না আর। কয়েক ঘণ্টা থেকেই করছে না। সেন্‌সাস-এর কাজে নামলে জুতোর মচমচানি বেশী দিন থাকে না।

সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠলাম। হয়রান হয়ে গেছি সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে। বেল টিপলাম। হয়রান হয়ে গেছি বেল টিপে টিপে। ভিতরে পায়ের শব্দ। হয়রান হয়ে গেছি পায়ের শব্দ শুনে শুনে।

তবু, চাঙ্গা করে তুললাম নিজেকে।

"ঐ আসছে"—ভাবলাম আমি—"আর একটা নাক আসছে ঐ।"

সত্যি বলছি—নাক গুনে গুনে একান্তই হয়রান হয়ে গেছি আমি।

কথাটা বুঝলেন ত? সারাদিন হাঁটুন। দরজায় দরজায় বেল টিপুন। বগলে করে নিয়ে চলুন ভারী পোর্টফোলিও একটা। একই একঘেঁয়ে প্রশ্ন করে যান বার বার বহুবার। এর বদলে কী পাচ্ছেন? নাক প্রতি চার সেণ্ট। উন্নতি? অস্টরম্ভা। চার সেণ্ট ত চিরকালই চার সেণ্ট।

আজকের নাক গুনতি কোনমতে শেষ করলেন যদি, দিনের শেষে পেয়ে গেলেন নতুন একটা নাকের লিস্ট। কালকের জন্য। ফী-নাক চার সেণ্ট। বড় নাক, ছোট নাক। থ্যাবড়া নাক, বাঁকানো নাক। লাল, সাদা, নীল নাক। দেখতে দেখতে এমন হাল দাঁড়াবে যে নাকের কথা মনে হলেই মাথায় খুন চাপবে। দরজা ঈষৎ ফাঁক করে আবারও নাক বেরুবে যখন, ইচ্ছে হবে সেই নাকে ঘুষি মেরে পথে বেরিয়ে পড়তে।

ঘুষির কথা পরে, এখন আছি দাঁড়িয়ে। নাকটা বেরুক ত! চাঙ্গা করে তুলেছি নিজেকে। দরজা খুলল।

বেরুল সরু ধারালো চঞ্চু একটা। তার পিছনে মামুলী মুখ একখানা, তার সঙ্গে গিন্নী গিন্নী ধাঁচের আটপৌরে এক দেহ। নাকটা হাওয়া শুঁকল একবার, দোয়ামনা-ভাবে এধার ওধার নড়ল খানিকটা, তারপর বলল—"কী?"

"আমি আসছি মার্কিন সরকারের তরফ থেকে মাদাম। সেনসাস নিচ্ছি।"

"ওঃ, সেনসাসের লোক!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ভিতরে এসে দুই একটা কথা জেনে নিই যদি—?"

ঠিক এই আলাপই প্রতি দরজায় করছি সারাদিন। হয়রান!

"আসুন"—

আঁধার আঁধার হলঘর একটা। তার ভিতর দিয়ে আঁধার আঁধার বসবার ঘর একখানা। টেবিলের উপরে পোর্টফোলিও নামিয়ে রাখছি, তক্ষুণি একটা ল্যাম্প জ্বলে উঠল। আমি ব্যাগ খুলে ফর্ম বার করলাম।

গিন্নী লক্ষ্য করছে আমাকে। মুখে ভাবলেশ নেই তার। সব গিন্নীরই এই রকম দেখেছি! এনসাইক্লোপিডিয়া বেচতেই আসুক কেউ, কিংবা বিল আদায় করতেই আসুক, এক চোখ গিন্নীরা রান্নার স্টোভের উপরে রেখেছেই।

যাক, পঁয়ত্রিশটা প্রশ্ন পেরুতে হবে আমাকে। তাই দস্তুর। 'নারী-পুরুষ' ব্র্যাকেট পূরণ করলাম, 'জাতীয়তা' ব্র্যাকেটও। ঠিকানাটিও লিখে নিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা শুরু হল—"নাম?"

"লিজা রোজিনি—"

"বিবাহিতা? না—?"

"বিয়ে করি নি।"

"বয়স?"

"চারশো সাত।"

"ব—য়—স?"

"চার—শো—সাত।"

"অ্যাঁ? কী বললেন?"

"চা-র—শো—সাত।"

বাঃ! বেশ! তা বে-শ! সারাদিন খাটুনি, তারপর বেলা-শেষে পড়ে গেলাম এক পাগলীর পাল্লায়। ওর ভাবলেশশূন্য মুখখানার দিকে তাকালাম একবার। যাকগে, চটপট সেরে নিই। চটপট!

"কাজকর্ম কী করা হয়?

"ডাইনীগিরি।"

"কি-ঈ-ঈ?"

"বলছি ত আমি ডাইনী—"

চার সেণ্ট-এর বদলে এ-ঝামেলা পোষায় না। ভাবখানা দেখাচ্ছি যেন জবাবটা টুকে নিলাম, তারপর চলে গেলাম পরের প্রশ্নে—

"কাজটি কার অধীনে?"

"নিজের জন্যই কাজ করি, তবে কত্তার অধীনে অবশ্যি।"

"কত্তা?"

"শয়তান মার্কেটিং। শয়তান গো!"

দশ সেণ্ট-এর বদলেও পোষায় না এ-ঝামেলা। লিজা রোজিনি, অবিবাহিতা, বয়স চারশো সাত বছর, পেশায় ডাইনী, কাজ করে শয়তানের আফিসে। না, না, পঞ্চাশ সেণ্টেও যথেষ্ট মজুরি নয় এ-হাঙ্গামার।

"ধন্যবাদ। আর কিছু নয়। চলি এবার—"

স্ত্রীলোকটা গা করল না মোটেই। আমি কাগজখানা ভাঁজ করলাম, পোর্ট-ফোলিওতে ঠেসে ভরে দিলাম, টুপিটা তুলে নিলাম, ঘুরে দাঁড়ালাম, দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

দরজাটা লোপাট!

কী করব বলুন? সত্যিই লোপাট দরজাটা।

এক মিনিট আগেও ছিল দরজাটা। মামুলী একখানা বসবার ঘরে অতি মামুলী একান্ত সাধারণ একটা দরজা। একদিকে ছিল একখানা হাতলওয়ালা চেয়ার। আর একদিকে ছিল ছোট্ট টেবিল একখানা।

তা দেখুন, চেয়ারও রয়েছে, টেবিলও রয়েছে। কেবল দরজাটাই নেই দুইয়ের মাঝখানে।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম অন্য এক দিকে। দরজা হয়ত ওদিকে হতে পারে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। না, তবু দরজা দেখতে পাচ্ছি না। ঘরখানার কোন দিকেই নেই দরজা।

ঠিক আছে! এই রকমটাই হবে ত! সারাদিন টো-টো করে রেদ্দুরে ঘোরা কারু ধাতেই সয় না। সয় না যে, তার প্রথম লক্ষণ ঐ নাক দিয়ে মাথা ঘামান। দ্বিতীয় লক্ষণ প্রশ্নের জবাব ঠিকঠিক কানে না পৌঁছন। এই মহিলার কথাই ধরুন। উনি হয়ত বলেছেন কেরানী, আমি শুনেছি ডাইনী।

শেষ পর্যন্ত এই তৃতীয় লক্ষণ। একেবারে চরম। দরজা খুঁজে না পাওয়া।

তা বেশ! আমি স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে দাঁড়ালাম আবার।

এক হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা ও এগিয়ে দিল।
[পৃষ্ঠা ৬৪৮

"মাদাম! দয়া করে বেরুবার পথটা একটু দেখিয়ে দেবেন? আমি কেমন যেন ঠাহর পাচ্ছি না—"

"বেরুবার পথ ত নেই এখান থেকে!"

মজা আর কি! মহিলাটি তামাশা করছে নাকি, অ্যাঁ?

"কিন্তু ঢুকেছি যখন—"

"ঢুকেছেন যখন, বসুনই না একটু! আমার জোর বরাত যে আপনি এসে পড়েছেন—"

ডাইনীর মুখে এই কথা? 'এসে পড়েছেন?' দূর ছাই, কী বলছি! ডাইনী ত এ সত্যিই নয়! ডাইনী আবার আছে নাকি কোথাও? না নেই।

না, ডাইনী নেই। কিন্তু মুশকিল হল এইখানে যে দরজাও নেই।

"এস, এটু চা খাও আমার সঙ্গে—"

"না, না, দেরি হয়ে যাবে আমার—"

"চা ত তৈরী! বস ভাল-মানুষের ছেলে, বস। উনুন থেকে তুলে আনি চা—"

এতক্ষণ উনুন চোখে পড়েনি আমার, আগুনও না। কিন্তু জ্বলছে আগুন, তা ঠিক, আর তাতে বসান আছে চায়ের পাত্র। সে কুঁজো হল পাত্রটা তুলে আনবার জন্য। অমনি তার ছায়া পড়ল দেওয়ালে।

বাপ্! কি কালো! আর কী মস্ত ঐ ছায়াটা! দেয়ালের এধার থেকে ওধার হামা দিয়ে দিয়ে এগুচ্ছে যেন।

লিজা রোজিনির দিকে আবারও তাকাচ্ছি। এখনও তাকে গিন্নীবান্নী মেয়েছেলের মত দেখাচ্ছে। কালো চুল। আঁচড়ানো চুল। মাঝখানে সিঁথি। একহারা চেহারা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েনি এখন।

বয়স? চারশো সাত বছর? অ্যাঁ?

মরুক গে! ও চিন্তা থাকুক। মুখখানা ওর একান্ত মামুলী। নাক, চোখ, ঠোঁটে ঠোঁট এঁটে বসেছে। চোখের উপর পাতা আর নীচের পাতার মাঝখানে সরু ফাঁক একটু, এমন সরু যেন ছুরি দিয়ে চিরে বার করা হয়েছে। এ ছাড়া মুখখানার আর সবই মামুলী।

মামুলীই বটে, কিন্তু অমন চিমসে মুখের মতন দেখায় কেন? ঐ আগুনটার জন্যই হয় ত। নেচে নেচে উঠছে আগুনটা, আর তার লালচে আভায় ভারী যেন একটা শেয়ালপানা ধূর্তামি ফুটছে মুখখানায়।

নাঃ, ডাইনী টাইনী নয়, পাগলাটে। ডাইনি নেই। ছিল না কোনদিন।

তবে কথা এই, ভয় করছে কেমন যেন।

ও হাসছে আমার দিকে চেয়ে। একখানা থাবা, থুড়ি—হাত আর কি। এক হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা ও এগিয়ে দিল। বাদামী রং চায়ের, ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। চা। ডাইনীর হাতের চা। খেয়ে নাও, তারপর—

ধুত্তোর! খেয়ে নাও। আবোল তাবোল ভেবো না অমন। স্রেফ বোকামি এসব। আচ্ছা, দরজাটা তাহলে কোন্ দিকে? ঘরটা আঁধার লাগছে। আগুনটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। রীতিমত লাল ঐ আগুনটা। কিছুই পষ্টো মালুম হতে দেয় না। তা ছাড়া গরমও তেমনি এখানটা। নাও, চা-টুকু খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়।

ওর হাতেও একটা পেয়ালা। বিষ নয় তাহলে। হাঃ হাঃ! কিছু মিশিয়ে টিশিয়ে দেয় নি। আচ্ছা কি-সব মেশায় ডাইনীরা, অ্যাঁ? শেকড়-বাকড় বোধ হয়। আর ম্যাকবেথ নাটকে যা-সব পড়েছ, তাও নিশ্চয়। হাঃ হাঃ। সেকালের লোক বিশ্বাস করত ওসব। পাগল ছিল তারা।

তাহলে খেয়ে নিই চাটুকু। তারপর বেরিয়ে পড়ি।

"বেশী লোক আসে না এখানে—" কথাগুলো বেশ মোলায়েম শোনায়। টেবিলের

ওধারে ও বসে আছে। বুঝতে পারছি আমাকেই ও দেখছে। আমি হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলাম মুখে।

"আগে আসত। এখন মন্দা যাচ্ছে কাজ কারবার—"

"কারবার?"

"আহা! ডাইনীগিরি! জাদু! জাদু! এখন নাকি ওতে আর কাজ হয় না। আরে, লোকে বিশ্বাস করবে না ত কাজ হবে কী? বড় বড় কথা ছেড়েই দিই, এই যে সামান্য জিনিস—বশীকরণ—ওতেও নাকি কারও কোন দরকার নেই এখন। কতকাল যে মায়া-পুতুল গড়ে দেবার ফর্মাইস পাই নি।"

"মায়া পুতুল?"

"ঐ যে মোমের পুতুল গো! ঠিক মানুষের আকারে গড়া। শত্তুরের মরণ যদি চাও, তার নাম করে ঐ পুতুলে পিন ফুটিয়ে দাও। ব্যস, খতম! আজকাল আর তেমন হিংসাই করতে জানে না লোকে। ডাইনীর নজর পড়ুক শত্তুরের উপরে, এ আর চায় না কেউ। কতকাল যে মানুষ মারি নি! খুবই মন্দা চলছে কারবারে।"

ঠিক ঠিক! তা মন্দা যখন, গুটিয়ে ফেললেই হয় ত! আফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলে ক্ষতি কি? কত কারবারই ত ফেল হচ্ছে!

তবে হ্যাঁ, রোজগেরে মেয়ে ছিল একসময়। মুষড়ে পড়েছে, ব্যবসাতে ভাটির টান লাগতেই।

কিন্তু হাতটা আমার কাঁপছে যে? পেয়ালাটা পড়ে যেত আর একটু হলে।

"এত সব জাদু জানতাম! কিন্তু চা ত খাচ্ছ না?"

ফাঁসির আসামীকে ভরপেট খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল। খাও, খাও! কাজ দেবে!

"খেয়ে নাও চা—"

খেতে যে হবেই, তা আমার মনই বলছে আমাকে। না খেলে কেমন করে প্রমাণ হবে যে মেয়েমানুষটা পাগলা?

ডাইনী-টাইনী নেই। দেখ না, আমি এক চুমুকে খেয়ে ফেলছি ওর চা, খেলে হয় কি, শুনি?

কিন্তু আমার হাত? ও হাত একান্তই চাইছে না যে চা আমি খাই। রীতিমত কসরত করে করে আমি হাতকে বাধ্য করলাম পেয়ালাটা মুখে পৌঁছে দিতে।

আমি চুমুক দিচ্ছি, ও তাকিয়েই আছে।

তেতো, বিস্বাদ, কিন্তু গরম। গিলতে কই কোন কষ্ট ত হল না!

না, কষ্ট হয়েছে বলতে পারিনে, তবে কটু স্বাদটা যাচ্ছে না মুখ থেকে।

লিজা বলছে—"তুমি আমায় অবাক্ করেছ, ভালোমানুষের ছেলে। আমার পেশাটা নিয়ে একটা কথাও ত কইলে না তুমি! রোজই যে একটা করে ডাইনীর দেখা পাচ্ছ তুমি, তা ত আর নয়!"

রোজই যে ডাইনির দেখা পাই না, তাও কি আবার বলে দিতে হবে?

আমি বললাম—"অনেক কথাই কইবার আর শুনবার ছিল। আর এক সময় এসে—এখন কিন্তু লিষ্টিতে এক গাদা নাম বাকী রয়েছে আমার। উঠতেই হবে এবার। চায়ের জন্য ধন্যবাদ—"

কথা কইছি, আর দোরটা খুঁজছি চারদিকে তাকিয়ে। আগুনের আভা লালের জাল বুনেছে ঘরটা জুড়ে, কিন্তু জাল শুধু ঘরেই নয়। আমার এই মাথাটার মধ্যেও সেই লালের জাল যেন। শিখা তুলে নাচছে সেই লাল। চা-টা গরম ছিল খু-উ-ব। সেই গরম এখন ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার মাথায়। ঘরের ভিতর লাল জালে কালো ছায়ার ফোকর। মাথার মধ্যেও তাই। কালো কালো ছায়া। লাল আর কালোতে পাশাপাশি চিকিমিকি। মাথার ভিতর, চোখের সামনে। তারই জন্য দোরটা দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু দোরটা থাকবেই ত! আছেই নিশ্চয়। ঐ লাল-কালো জালের কোন একটা ফোকরের ভিতর আছেই তা। আছে নিশ্চয়। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না।

ওকে কিন্তু পষ্টো দেখতে পাচ্ছি। একটা হাসি তার মুখে। কিরকম হাসি বলব ওকে? নিষ্ঠুর হাসি? ব্যঙ্গ হাসি? যে হাসিই হোক, ওরই দরুন একটা বুড়ুটে ছাপ পড়েছে ওর মুখে। যদিও চামড়ায় কোঁচকানি নেই এতটুকু, ঐ হাসিটাই ওকে তের-কেলে বুড়ীতে পরিণত করেছে। মড়ার খুলির দাঁতে যে-রকম হাসি লেগে থাকে, সেই রকমটাই।

হ্যাঁ, ওকে ঠিকই দেখছি, দেখছি না শুধু দরজাটা।

বললাম—"এবার যেতে হবেই—"।

নিজের কানেই ঠেকল—যেন আমার কথা আমার নয়, যেন অনেক দূর থেকে অন্য কেউ কথা কয়ে উঠেছে। অনেক কিছুই দূরে সরে গিয়েছে, দেখছি। কাছে ঘনিয়ে এসেছে শুধু লিজার দুটো চোখ। আর সেই চোখ থেকে বেরুচ্ছে লাল আলো আর কালো ছায়া।

উঠে দাঁড়িয়েছি।

অর্থাৎ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

একবার এক সরাইখানায় নয় বোতল ভড্‌কা খেয়েছিলাম একাসনে বসে। যখন বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম—আমি মেজেতে সটান শুয়ে আছি।

আজ খেয়েছি এক পেয়ালা চা শুধু। খেয়ে যখন উঠে দাঁড়িয়েছি—

দেখলাম আমি উঠেই যাচ্ছি। ভাসছি হাওয়ায়। পা আর মেজে ছুঁয়ে নেই। দাঁড়িয়ে আছে হাওয়ার উপরে। নীরেট হাওয়া। লাল আলো আর কালো ছায়া দিয়ে গড়া। সারা অঙ্গে শিরায় শিরায় কী যেন চিনচিন করে চলেছে। ছোট ছোট সূচ যেন বিঁধে রয়েছে গায়ে। বাতাসেই হাত-পা নাড়ছি আমি—

"এক্ষুণি যেয়ো না গো"—বলল লিজা।

আমি যে কী অবস্থায় আছি, তা যেন ও দেখেই নি। অন্ততঃ ওর গলার স্বর শুনে মনে হয় না যে দেখেছে। তবু, বুঝেছে ঠিকই। তা নইলে হাসে কেন ওভাবে? বলল—"এক্ষুণি যেয়ো না তুমি। তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাব আমি—"

"নিয়ে যাবে?"

"মানে—এক জায়গায় আমার যেতে হবে কিনা!"

"নেমন্তন্ন?" ভাঙ্গি ত মচকাই না। সদা সপ্রতিভ, মুখে উতোরটি যুগিয়েই আছে। কোথায় কী অবস্থায় আছি, তা যেন ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না!

হাসি তার মুখে লেগেই আছে। একটা হাই তুলল, কী যেন ভাবছে—"তা—নেমন্তন্নই বলতে পার একরকম। মেয়েছেলের একা নেমন্তন্নে যাওয়া ভদ্রোচিত নয় ঠিক, কী বল? তাই সঙ্গে নিতে চাই তোমায়।"

কী ভদ্রোচিত, কী নয়, ডাইনীরাও মানে তাহলে! তা না হয় মানুক; কিন্তু হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এ আলোচনা—আমি নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছি, তা নইলে এসব কথায় কান দিতাম না কক্ষণো।

লিজা বলছে—"কথাটা কী জান—কতকগুলো নিয়ম আমাদের মেনে চলতে হয়। ডিনারের টেবিলে তোমরা প্রাণান্তেও তেরোজন একসাথে বসবে না। আমরা কিন্তু মজলিসে বসবই না, তেরোজন না হলে। মজলিস মানেই তেরোজন। না হলে উনি চটে যাবেন।"

"উনি?"

"শয়তান! মার্কট্রিস শয়তান।" আবার সেই হাসি। এখন ওর এক একটা হাসির ঝিলিক যেন চাবুকের এক একটা ঘায়ের মত আমার বুকের ভিতর কেটে কেটে বসে যাচ্ছে।

কথা ওর শেষ হয়নি। কি বলছে এবার? "আজ তাই আমাদের মজলিসে তোমায় আসতেই হচ্ছে, এই রাতেই। মেগই আমার সাথী হয় বরাবর। তা আজ সে আসবে না কিনা, তারই বদলি—"

"ডাইনীর মজলিস?"

"হ্যাঁ, ডাইনীরই মজলিস বটে। পাহাড়ের মাথায় বসে। যেতে হবে অনেকটা, তুমি তৈরী হয়ে নাও।"

"উঁহুঃ, আমি যাচ্ছি না—"

আপত্তিটা যেন আমার নিজেরই কানে হাস্যকর শোনাল। মা-বাপ তিন বছরের খোকাকে বলছে—"শুতে যাও বাবা।" খোকা বলছে—"যাব না।" তেমনিই হাস্যকর। যে লোক হাওয়ায় ভাসছে হাঁইফাঁই করতে করতে, তার আপত্তির কতটুকু দাম ?

"ম্যাগিট ! ভালোমানুষের ছেলেকে বানিয়ে ফেল।"

বানানো ? সে আবার কী ? কশাইয়েরা জন্তুগুলোকে বানায়, মানে জবাই করে। এটা নিশ্চয় সে-রকম বানানো নয়—

দরজা নেই, তবু ম্যাগিটের উদয় হল ঘরের ভিতর।

ম্যাগিট যে সত্যি সত্যি কী, হঠাৎ বুঝতে পারলাম না। ছোট্ট ভেড়ার লোমের মত লোম গায়ে। বেজির মত দেহ—মানুষের মত হাত। মুখ একখানা আছে, কিন্তু সে মুখ মানুষের মুখ নয়, যদিও তাতে চোখ কান নাক মুখ কোন কিছুরই অভাব নেই।

কিন্তু ম্যাগিটের আসল বৈশিষ্ট্য এসবের কোন কিছুতে নয়। ওর চেহারার ভিতর যা সব চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল একটা নির্ভেজাল অকল্যাণের ছাপ। ওর সর্বাঙ্গ থেকে ভকভক করে বেরুচ্ছে একটা পাপের ধোঁয়া। মুখে ওর দেঁতো হাসি লেপটে রয়েছে একটা। সে হাসি যেন বলতে চাইছে—"যুগ যুগান্তের অভিজ্ঞতা কারও যদি থাকে ত আছে আমার। যে অভিজ্ঞতা মানুষ বা পশু কারও থাকার কথা নয়।"

"কী বলছ লিজা ঠাকরুন ?" মেজের উপর দিয়ে সড়সড় করে চলে আসতে আসতে ম্যাগিট জানতে চাইল যে-স্বরে, তা ক্ষীণ হলেও মগজে ঢুকে যায় সূঁচের মত।

সব ডাইনীকেই এক একটা হুকুমবরদার দেয় শয়তান, ম্যাগিট হল লিজার সেই হুকুমবরদার। মজলিসে কালো বাইবেল যখন সই করে ডাইনীরা, তখনই পায় এই উপহার, ইতর প্রাণীর দেহধারী ক্ষুদে পিশাচ এক একটা।

ম্যাগিট আমার গা বেয়ে উঠল। লিজা একটা বোতল থেকে বার করল খানিকটা হলদে মলম। ম্যাগিট তাই নিয়ে তোফা করে মালিশ লাগাল আমার বুকে পিঠে গলায়। মলম যেখানে লাগে, সেখানটা জ্বলে যেতে চায় যেন।

"ঐ হ'ল উড়ুক্কু মলম, এবার চল যাই"—বলল লিজা।

ওর গায়ে আর তখন কাপড়চোপড় নেই। মাথার কালো চুল এলিয়ে দিয়েছে ও, আঙ্গরাখার মতন তাইতেই ঢাকা পড়েছে দেহ।

আমি ত আগে থেকেই হাওয়ায় ভাসছি। লিজাও ভাসতে ভাসতে আমার পাশে এল। তারপর ধরল আমার হাত। চিনচিন করে কিসের যেন ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে লাগল

আমার সারা দেহে। উঠছি এবার। ছাদে একটা দরজা না? ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে গেলাম। অন্ধকার। কালো রাত্রি! ভেসে চলেছি। ও ধরে আছে আমায়।

উঠে যাচ্ছি সেই কালোর ভিতরে। ওর নিরাবরণ সাদা দেহ বেঁকে বেঁকে উড়ছে অর্ধচন্দ্র যেমন দুই শিং বাগিয়ে আকাশে ওড়ে।

উড়ছি! উড়ছি! হঠাৎ এক সময়ে সাঁ করে নামতে শুরু করেছি আমরা। আর জ্বলছে না আমার গায়ের চামড়া। দু'পাশ দিয়ে হাওয়া ছুটছে ঝড়ের বেগে। নীচে জ্বলছে শহরের লক্ষ আলো। ছোট ছোট আলো, রাত্রির বিশাল অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য জ্বালা হয় যাদের। বিশাল আঁধার। যেখানে নেকড়েরা গর্জায়, প্যাঁচার ঘুৎকার ওঠে ভূত-ভূতুম! যেখানে মড়াদের বাস, আবার তারাও ঘোরে ফেরে, যাদের অনেক আগেই মরার কথা ছিল। পাহারা দেবার জন্য আলো। ভয়কে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য আলো।

কতক্ষণ উড়েছি, কতদূর উড়ে গিয়েছি, মালুম নেই। কীভাবে নেমে পড়েছি, তাও জানি না। একটা কালো পাহাড়। গম্বুজের মত তার উপরদিকটা, তারই চূড়ায় একটা আগুন। কয়েকটা মূর্তি গুঁড়ি মেরে রয়েছে, ছায়া-ঢাকা গিরিসানুতে সাদা দেখাচ্ছে তাদের। আবার উপরের আগুন থেকে আলো এসে পড়ছে যেই, তখন ওদের দেখাচ্ছে কালো।

মূর্তিগুলোর পায়ের কাছে ম্যাগিটের মত লোমশ প্রাণী অনেকগুলো। মূর্তির সংখ্যা এক—দুই—তিন—চার—

এগারো।

তার উপর লিজা আর আমি। ঠিক! তেরোই বটে। ডাইনীর মজলিসে তেরোজন চাই-ই। তার উপরে আর একজনও আছে অবশ্য, বলির পশুটা। একটা কালো ছাগল। আগুনের সামনে পাথর একখানা। লিজা ছাগলটাকে সেইখানে নিয়ে গেল। আর একটা ডাইনী ছুরি বসাল। আরও একজন রক্তটা ধরল গামলায়। গামলা ভরে উঠল যখন, সবাই খেলো সেই রক্ত।

হাঁ ত! বলছি ত যে সবাই খেলো! সব্বাই!

তারপর ঢাক বাজতে লাগল কোথায়, নাচ শুরু হল। আমিও নাচছি। লোমশ প্রাণীগুলো খালি গামলার ভিতরটা চাটছে, আর কী যে কথা কইছে কিচির মিচির, ঢাকের বাদ্যি আর নাচিয়েদের চিল্লানিতে শোনা যাচ্ছে না তা।

এক ডাইনী বলল—"লিজা, একটা নতুন লোক এনেছিস যে?"

"মেগ আজ আসতে পারে নি, তারই বদল"—উত্তর দিল লিজা।

চিল্লানি তুঙ্গে উঠছে, আগুন আকাশ ছোঁবার জন্য লাফিয়ে উঠছে। কাকে যেন ডাকছে আর ডাকছে, ক্রমাগতই ডেকে চলেছে ডাইনীরা!

সেই একজন—কেউ এলেন।

কোথাও মাটি ফুঁড়ে আগুন উঠল না, কোথাও আকাশ থেকে বিদ্যুৎ চমকাল না। নাটুকেপনা মোটেই নয়। সে-সব যা, তা ঐ ডাইনীরা করেছে। নতুন কী আর! অসভ্য দেশে বর্বরেরা তাদের পাথরের বিগ্রহ ঘিরে ঐরকমই করে।

ইনি যে এলেন, একেবারেই ঘরোয়া কায়দায়। একটা পাথরের পিছন থেকে এক পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন মজলিসের সামনে, বগলে মোটা একখানা খাতা। ঠিক যেন হিসাব-পরীক্ষক এসে ব্যাঙ্কে ঢুকলেন।

তবে ব্যাঙ্কের হিসাব পরীক্ষকেরা কালো নয় এই মার্কিন মুলুকে। ইনি কালো। দস্তুর-মত। চোখের তারা পর্যন্ত। হাতের নখ পর্যন্ত। ওঁর গায়ে কি একটা কালো আঙ্গরাখাও আছে নাকি? ঠিক বুঝতে পারছি না।

উনি এলেন, এরা নিশ্চুপ। উনি খাতা খুললেন, এরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। সবাই কিছু না কিছু বলছে বিড়বিড় করে। আমি পাহাড়ে হেলান দিয়ে আছি।

লিজা রোজিনি কি বলছে ওঁকে, আঙ্গুল দেখাচ্ছে আমার দিকে। আমার দিকে উনি ফিরে তাকালেন না। কিন্তু আমি জানি, উনি দেখছেন আমাকে। তিনি হাসেন নি, মাথা নাড়েন নি, কোন ইশারাও করেন নি। কিন্তু আমার কেমন মনে হল—উনি হেসেছেন, মাথাও নেড়েছেন, ইশারাও করেছেন আমাকে।

কী সব হুকুম দিচ্ছেন উনি। কার কী বলার আছে, শুনছেন।

কারবার সংক্রান্ত মিটিং এটা। শয়তান কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড। কোথায় কার আত্মা কেনাবেচা হয়েছে, অমুকের তমুক মহাপাপ খাতায় লেখা হয়েছে কিনা, এইসব আলোচনা। কালো মূর্তি লিখেই চলেছেন ঐ মস্ত খাতায়। আমার ভয় পাবার মত কিছু দেখছি না। কালো মূর্তির সব কাজই একান্ত মামুলী, নিছক গদ্য।

এইবার একটা ঘটনা ঘটল। একটা চিৎকার ডাইনীদের গলা থেকে।

"মেগ! মেগ এসেছে যে!"

যে ডাইনীর আসার কথা ছিল না, সেই মেগ।

সব ডাইনী দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে ওর পানে।

উনি কথা কইলেন এইবার। সে স্বরের বর্ণনা দেওয়া যায় না। আগ্নেয়গিরির উদরে যে গুরুগুরু গর্জন ওঠে অগ্ন্যুৎপাতের আগে, তার সঙ্গে তুলনা দেব? নাঃ, ওর কাছেও তা পৌঁছোয় না।

"মজলিসে আজ চৌদ্দ জন।"

এইবার কাঁপছি। আমি একা নই, ডাইনীরাও কাঁপছে। লিজা ঘুরপাক খেতে লাগল, যেন তার মাথায় ডাণ্ডার ঘা মেরেছে কেউ। তারপর আমার ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল ওঁর সামনে—

"আমি জানতাম—মেগ আসছে না—"

"চৌদ্দ জন! চৌ-দ্দ!" এতক্ষণ রাগের একটা আভাস কথায়।

"কিন্তু আমি—"

"আইন একটা আছে আমাদের। তা ভাঙ্গলে আছে সাজা—"

"দয়া—"

ওঁর কাছে দয়া? আমি নিজের চোখেই দেখলাম। উনি লিজার ডান হাতটা ধরলেন। লিজা বাঁ হাতে নিজের গলাটা চেপে ধরল। তারপর লিজা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল, তারপর ছটফটানি শেষ হয়ে গেল তার।

"লিজার স্থান তোমার হল। সই কর।"

ওঁর কালো চোখের কালো তারা আমার উপরে নিবদ্ধ এইবার।

"তেরো জন চাই-ই। বেশীও না, কমও না। ঐ হল আইন। কাজেই লিজার স্থান তোমার হল। সই কর।"

"আমি?" ওর চেয়ে বেশী আর কিছু মুখে এল না আমার।

এলেও লাভ ছিল না। ওঁর সঙ্গে তর্ক চলে না।

এক ডাইনী গামলাটা এগিয়ে ধরেছে। আর এক ডাইনী হাত ধরল আমার। উনি খাতা খুলে ধরেছেন আমার সমুখে।

ম্যাগিট তরতর করে আমার গা বেয়ে উঠে এল গলার কাছে, কুটকুট করে কামড়ে দিল গলায়। সরু ধারার রক্ত ঝরে পড়ল গামলায়। একটা সরু কাঠি ঐ রক্তে ডুবিয়ে দিল একজন। কাঠিটা আমার হাতে গুঁজে দিল।

কালো মূর্তি বলছেন—"কর সই"—

ও-হুকুম অমান্য করা চলে না। আমার আঙুল নড়ছে, আমি সই করছি।

তারপর ওঁর হাত, কালো একখানা হাত এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরল। একটা প্লাবন চলে গেল আমার উপর দিয়ে। লাল-কালোয় ঝঞ্ঝায় গর্জনে মেশানো একটা দুর্বার তরঙ্গ।

মাটিতে ওটা কী পড়ে আছে গো? লিজা রোজিনি ত নয়! দেহটা যেন চেনা-চেনা লাগছে? আমার না কি? এ্যাঁ? আমারই না কি?

"খ্রীষ্টধর্মে যা দীক্ষা হয়েছিল তোমার"—বলছেন উনি—"তা এই বাতিল করে দিলাম আমি।"

ম্যাগিট কানে কানে বলল—"ওড়ো এইবার"—

লিজা রোজিনির বাড়িতেই আমি ঘুমোলাম সে-রাত্তিরে। মনে জানি—ঘুম ভাঙ্গলেই দেখব—রাতের দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে।

ঘুম ভাঙ্গল। আয়নার মুখ দেখে চমকে উঠলাম।

আয়নার ভিতরে লিজা রোজিনি। ডাইনী লিজা। দেহের ভিতরটা আমি, বাইরেটা লিজা।

ম্যাগিট কিচিরমিচির করছে আমার পায়ের কাছে। *

* রবার্ট ব্লচ রচিত "এ কোশ্চেন অব্ এটিকেট" অবলম্বনে।

বিচারালয়—

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত। এইখানে বিচারের শেষ। নীচু কোর্টের বিচারে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি অ্যাপিল কোর্টে যায়। সেখানে জিততে না পারলে সুপ্রীম কোর্টে আরজি করে। এই সেই সুপ্রীম কোর্টের ছবি।

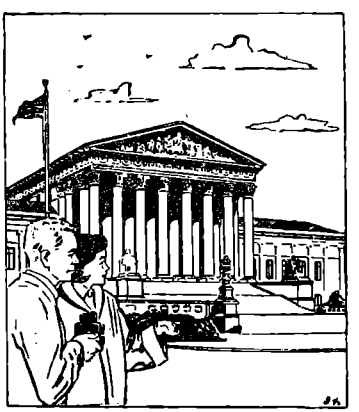

সব্যসাচী

৭

যুদ্ধ? যা হল, তাকে যুদ্ধই বলতে হয় যদি, তবে তার আখ্যা দিতে হয় অসম যুদ্ধ। একান্ত একতরফা ব্যাপার। টারজানের গায়ে একটি বল্লমও লাগল না ক্যাথনিবাসীদের। নদীতে মাথা-সমান ঢেউ উঠছে। শত্রুর গায়ে, সেই ঢেউ ভেদ করে, বল্লম লাগবে কেমন করে?

আর সিংহেরা? শান্ত জলে তারা নামে বটে বিশেষ গরজ থাকলে, কিন্তু সাধারণতঃ জল তারা পছন্দ করে না। এই বন্যা-বিক্ষোভের ভিতরে নদীতে নামার কোন আগ্রহই তারা দেখাল না। আর লাফান? লাফিয়ে তারা পড়বে কোথায়, তাই ত তারা জানে না! তার উপর, ত্রিশ ফুট ব্যবধান মহারণ্যের ন্যুমামহারাজেরা যদি বা ক্বচিৎ কদাচিৎ লাফিয়ে পেরিয়ে থাকেন, ক্যাথনির এই গৃহপালিত আদুরে কেশরীপুঙ্গবেরা তার ধারে কাছেও যাননি কখনো।

কিন্তু টারজানের তরফ থেকে তীর আসছে ক্রমাগত। ঢেউয়ের ঠিক উপর দিয়ে তারা আসে, এপার বরাবর এসে তাদের মাথাগুলো নুয়ে পড়ে একটুখানি, প্যাঁট করে বেঁধে এসে দুশমনের চোখে মুখে বা গলায় বুকে। দেখতে দেখতে গোটা দুই মানুষ আর দুটো সিংহ ধরা-শয্যা গ্রহণ করল শরাহত হয়ে। বাকী সব পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তীরের পাল্লার বাইরে, অর্থাৎ মাঠের মাঝামাঝি জায়গায়। একেবারে পালান চলে না তাদের, সে কাজ করলে রানীর বিচারে প্রাণদণ্ড সুনিশ্চিত।

যাক, তারা আর আক্রমণ করছে না টারজানকে। কিন্তু তাতে যে টারজানের উপকার হচ্ছে খুব বেশী, তাও ত নয়! ভ্যালথরের খোঁজে যাওয়া বন্ধ হয়েছে তার। স্বাধীনভাবে

তার চলাফেরার পথও হয়েছে বন্ধ। বলতে গেলে এই প্রায় নিমজ্জিত শিলাস্তূপটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কয়েদখানা। জলে নামলে স্রোতে ভেসে যেতে হবে, স্রোত এখনও যথেষ্ট বেগেই বইছে। আর ডাঙ্গায় লাফিয়ে পড়লে—ঐ ত সেই শত্রুরাই এখনও সশরীরে হাজির ঐখানে। তাদের সংখ্যা কিছু কমেছে বটে, কিন্তু যারা অবশিষ্ট আছে, মুখোমুখি লড়াইয়ে টারজানকে ঘায়েল করার পক্ষে তারাই যথেষ্ট, তা টারজান যতই শক্তিধর হোক না কেন।

বাকী রইল বায়ুপথ। তা কাঁধের নীচে পাখা না গজানো পর্যন্ত সে চেষ্টা করে ত ফল নেই। অতএব টারজান সেই জলের ভিতরই জাপটে বসে গেল বিশ্রাম নেবার জন্য। এক চোখ জলে, এক চোখ স্থলে। আর অদৃশ্য তৃতীয় নেত্র আসন্ন ভবিষ্যতের গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অতিমাত্র সজাগ। কী হবে টারজানের? কী? কী? কী?

দীর্ঘ রজনী এইভাবেই কেটে গেল। কল্লোলিত নদী সফেন তরঙ্গ দিয়ে স্নান করিয়ে দিচ্ছে টারজানের বীরবপু। প্রান্তর থেকে সিংহগর্জন ধ্বনিত হচ্ছে টারজানকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়ে জানিয়ে। সারা দীর্ঘরাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পরে অবশেষে একসময় মেঘমুক্ত পূর্বগগনে ফুটে উঠল রক্তিম ঊষার আভাস।

আর সেইক্ষণেই টারজানের কানে ভেসে এল একটা দূরাগত কোলাহলের রেশ। সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। দূরের বনে মৌচাক থেকে লক্ষ মৌমাছি যখন অভিযানে বেরোয় এক সাথে, তখন লোকালয়ে বসে এমনিধারা একটা গুঞ্জন শুনতে পায় ত্রস্ত গ্রামবাসীরা। ঐ মাছির ঝাঁক গাঁয়ে এসে পড়ে যদি, মানুষ জন্তু সবাইয়েরই হবে প্রাণসংশয়।

সেই সুদূরের বিভীষিকায় মাখা এই ক্রুদ্ধ গুঞ্জনও, যেটা এই মুহূর্তে টারজান শুনতে পাচ্ছে। কী এটা হতে পারে, একটা আন্দাজও করে নিয়েছে তার। খুব সম্ভব এটা রণযাত্রী কোন সৈন্যদলের স্তিমিত কলরব। মধ্য আফ্রিকার বহুদেশে সৈন্য চলাচলের ধারে কাছে টারজানকে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থাকতে হয়েছে। নীরবে অভিযান করা এদেশের যোদ্ধাদের ধাতুতে নেই, ওটা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সব সময়ই তাদের চলাচল থেকে উদ্ভূত হয় একটা চাপা কোলাহল। আজ এই মুহূর্তে টারজান যা শুনছে, সেটা সেই রকমই কিছু একটা।

শব্দটা শুনেছে সিংহরাও। কারণ বন্য পশুদের শ্রবণ আর ঘ্রাণের শক্তি মানুষের চাইতে অনেক বেশী। হ্যাঁ, সিংহেরাও শুনেছে। তারা হয়ে উঠেছে চঞ্চল। নতুন শত্রুর আগমন শঙ্কায়। কিন্তু তাদের রক্ষকেরা? তারা টের পায়নি কিছু। সারা রাত্রি জেগে জেগে এখন তারা বসে পড়েছে মাঠের উপরে, সিংহদের পিছনেই। রাতটা ভাল রকম কেটে গেলে প্রথমে তত্ত্বাবধায়কের, পরে রানীর দরবারে খবর পাঠাবে তারা, গত রজনীর চমকপ্রদ ঘটনার। ততক্ষণ তারা বসে বসেই ঝিমিয়ে নিচ্ছে একটু। তারা শোনেনি কোন শব্দ।

অথচ ওটা জোরালো হচ্ছে ক্রমে। নদীতীর বেয়ে এদিকেই আসছে। ভাটি থেকে উজানে। ভাটিতে, বাঁয়ে একটা গিরিসংকটের ওপারে থেনারের উপত্যকা, তার ভিতর আছে অ্যাথনি নামক নগর, গজদন্তের পুরী বলে যাকে জানে কাফা কোহেটুং পাহাড় অঞ্চলের শিফটা দস্যুরা। ক্যাথনি আর অ্যাথনির মধ্যে যে মাঝে মাঝেই জ্ঞাতিযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে থাকে, এ-তথ্য ত ভ্যালথরের মুখ থেকেই শোনা আছে তার। কখনো অ্যাথনি থেকে আসে হস্তীচমূ, কখনো ক্যাথনি থেকে সিংহবাহিত রথে রণযাত্রা করে অন্তারের সেনাদল। সাময়িক জয়পরাজয় যেটা ঘটে, তার ফলে স্মরণাতীত যুগের শত্রুতার অবসান ঘটে না কোনদিন। নিকট ভবিষ্যতে পুনশ্চ বিস্ফোরণের জন্য তৈরী থাকে উভয় সম্প্রদায়ই।

একজন উঠে দাঁড়িয়ে কী নিবেদন করল রথীকে। [পৃষ্ঠা ৬৬০

আজ তাহলে সেইরকমই একটা বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে। দূরাগত ঐ মন্দীভূত কলরব থেনার-বাহিনীর না হয়ে যায় না। কথা এই, ভ্যালথরের সঙ্গে কি ঐ বাহিনীর সাক্ষাৎ হয়েছে? বা হবে? হয় যদি, ওরা টারজানকে মিত্র বলে গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য ওরা ক্যাথনিতে পৌঁছোবার আগে যদি সে মারা না পড়ে।

এক্ষুণি অবশ্য টারজানের মৃত্যুর কোন আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে না কোন দিক থেকে। যদি না অবশ্য কুমিরের লেজের ঝাপটা খেয়ে সে জলে পড়ে যায় আবার। নদীটা এ যাত্রায় তাকে বাঁচিয়েছে, তাতে ভুল নেই। কিন্তু প্রথম সুযোগেই এ ত্রাণকর্ত্রীর আশ্রয় ত্যাগ করে যাওয়া দরকার।

যাওয়ার কিন্তু উপায় নেই, যতক্ষণ সামনের মাঠে ঐ ক্যাথনিওয়ালারা বসে আছে ধরনা দিয়ে।

কিন্তু ও কে আসে? ঐ সিংহবাহিত রথে?

মস্ত মস্ত চারটা সিংহ। তারা একটা ছাদ খোলা গাড়িতে যোতা রয়েছে নিরীহ বলদের মত। আর গাড়িতে বসে ক্রমাগত তাদের মাথার উপরে চাবুক ঘোরাচ্ছে এক স্বর্ণবর্মধারী যুবা পুরুষ। বর্ম যে সোনার তা এতদূর থেকেও বুঝতে পেরেছে টারজান। সোনা না হলে প্রভাত রৌদ্রে অমন ঝলকাবে কেন?

ভ্যালথর পরে হাতীর দাঁতের বর্ম, ক্যাথনির এই যুবা পরে সোনার। অ্যাথনি আর ক্যাথনির কলহ হচ্ছে মূলতঃ গজদন্ত বনাম স্বর্ণের কলহ। একথা আগেও শোনা ছিল টারজানের, ঐ হঠাৎ পাওয়া হঠাৎ হারানো বন্ধু ভ্যালথরের মুখ থেকে।

রথ এসে সেইখানে দাঁড়াল, যেখানে টারজানের শত্রুরা দল বেঁধে শুয়ে বসে বিশ্রাম করছে ও নদীবক্ষবিহারী দুশমনকে পাহারা দিচ্ছে। ওরা আগেই ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রথ আসতে দেখে। এইবার রথ থামল যখন, মানুষগুলো একেবারে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

রথী যুবক কী বলল ওদের, ওদের ভিতরও একজন উঠে দাঁড়িয়ে কী নিবেদন করল রথীকে, নদীর ভিতর দাঁড়িয়ে টারজানের তা শুনতে পাওয়ার কথা নয়। পেলোও না সে। তবে কথার ফাঁকে ফাঁকে পিছন ফিরে লোকটা টারজানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে মাঝে মাঝে। এইটি দেখে টারজান বুঝতে পারছে যে লোকটার এত্তেলা তারই ব্যাপার সম্পর্কিত।

রথী লোকটা চুপ করে শুনল সব, তারপর সাঁ সাঁ শব্দে হাতের চামড়ার চাবুকগাছা হাওয়ায় ঘুরিয়ে আনল একবার। অমনি রথবাহী সিংহেরা সমুখ পানে দৌড়োল সমবেত ক্যাথনিবাসীদের অবাক্ করে দিয়ে। দুই একজন বিনীত অথচ দৃঢ় স্বরে চেঁচিয়ে নিষেধও করল তাকে—মালিক! যাবেন না, যাবেন না আর। ও লোকটার হাতে ধারালো কাঠি আছে একরকম, ছুঁড়লেই মারা পড়বেন আপনি। যেমন মরেছে নদীর ধারের ঐ সাথীরা আমাদের।"

রথী ভ্রূক্ষেপও করল না এসব সতর্কবাণীতে। একেবারে নদীর কূলেই এসে রথ থামাল। বলা বাহুল্য, টারজান তাকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ার কথা একবারও চিন্তা করেনি। আক্রান্ত না হলে কাউকে আঘাত করা স্বভাব নয় তার। এ লোকটার মনে হিংসা আছে বলে ত এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে না টারজানের। আর তা থাকলেই বা কী হবে? যতদূর দেখা যাচ্ছে—ও ত নিরস্ত্র।

"তুমি কে?"—রথীর তরফ থেকে এল কৌতূহলী প্রশ্ন। খুব আশ্চর্য কথাই বলতে হবে, তার কণ্ঠস্বর মোটামুটি রকম ভদ্রোচিতই।

টারজান বুঝতে পেরেছে তার কথা। কারণ ভ্যালথরের কাছে যে ভাষায় পাঠ গ্রহণ

করেছে ও, তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এ-রথীর কথ্য ভাষা। সেও ভদ্রভাবেই চেঁচিয়ে বলল—"আমি এ দেশের লোক নই। বাড়ি আমার বহু, বহু দক্ষিণে, কয়েক মাসের হাঁটা পথের দূরত্বে। শিকার করতে কোহেটুং জঙ্গলে এসে পথ হারিয়ে ফেলি! তারপর, যেদিকে চুচক্ষু যায়, হাঁটতে হাঁটতে বোধহয় ভুল পথেই এসে পড়েছি।"

"আমাদের এ-ভাষা তুমি জানলে কেমন করে? এটা ত অন্থার আর থেনারের বাইরে আর কোথাও চালু নয়।"

"ভুল তোমার"—বলল টারজান—"কাফার দক্ষিণেও এ-ভাষা চলে। হাবসি মুলুকের পাঁচটা চালু জবানের মধ্যে এটাও একটা। আমি কাফায় ছিলাম ঢের দিন, সেখানেই শিখেছি এটা।"

"তা না হয় হল। কিন্তু তুমি এখানে এসে পড়লে কীভাবে?"

"বন্যার তোড়ে"—সত্য কথাই এবারে বলল টারজান।

"এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে ভেবেছ?"—লোকটা কথাবার্তায় রূঢ় হতে চাইছে, কিন্তু তার দুই চোখে কৌতুকের ঝিলিক দেখে টারজান ধরে ফেলল যে ওটা তার অভিনয় মাত্র, টারজানকে সে কুনজরে দেখে নি গোড়া থেকেই।

"কী তবে বিশ্বাস করবে লোকে? অর্থাৎ কী বিশ্বাস করতে পারলে এখানকার কেউ-কেটারা খুশী হবেন?"—টারজানেরও চোখে এইরকম কৌতুকের ঝিলিক।

"লোকে খুশী হবে তোমায় অ্যাথনিবাসীদের গুপ্তচর বলে প্রমাণ করতে পারলে। কারণ তার ফলে সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া যাবে তোমায়, লোকে দেখে আমোদ পাবে।"

টারজান ভিতরে ভিতরে চিন্তিত হয়ে উঠল। অ্যাথনির গুপ্তচর সে নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু অ্যাথনিবাসী ভ্যালথর তার সহচর ছিল দীর্ঘদিন এবং তার কাছেই এ দেশের ভাষা সে শিক্ষা করেছে, এইরকমই ধারণা যদি ওরা করে বসে, তাহলে ক্যাথনিতে কোন কালেই নিরাপদ হতে পারবে না সে।

অবশ্য নিরাপদ সে এখনও নয়। গোড়া থেকেই একটা অনভিপ্রেত এবং অহেতুক বিবাদ ওর বেধেছে ঐ সিংহরক্ষকগুলোর সাথে এবং তার ফলে খোদ রানীর রোষও স্বাভাবিকভাবেই তার উপরে এসে পড়তে পারে। কিন্তু এই ভদ্রলোক যদি প্রসন্ন থাকেন তার উপরে, সে রোষ থেকে অব্যাহতি পাওয়াও অসম্ভব না হতে পারে। লোকটি ভাল বলেই মনে হয়। এ যদি বেয়াড়া সুরে কথা কইতে শুরু না করে, টারজান রাজী আছে এর সঙ্গে মিত্রবৎ ব্যবহার করতে।

"তুমি এখানে পৌঁছোলে কী করে? এই দারুণ ঢেউ ঠেলে?" প্রশ্ন করল আগন্তুক।

"তোমার লোকেরা বলে নি তা? লাফিয়ে।" উত্তর দিল টারজান।

লোকটা অবিশ্বাস করল না কি? করা অসম্ভব নয়। যে সুরে সে জবাব দিল, তার ভিতরে ব্যঙ্গের একটু ভেজাল টের পাওয়া যায় যেন। জবাবটা এই—"তাহলে লাফিয়েই ফিরে এস কূলে। রানীর কাছে নিয়ে যাব তোমায়।"

"লাফিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে ঠিকই"—বলল টারজান—"কিন্তু লাফিয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়! কারণ আসার সময় লাফের পিছনে ছিল লম্বা একটা দৌড়। তাতে লাফটা অনেক বেশী জোরালো হয়, তা জান নিশ্চয়ই। ফিরে যাওয়ার সময় সে-সুবিধা পাচ্ছি না। জলের উপর দিয়ে ত দৌড়োতে পারব না।"

"তা বটে"—স্বীকার করল আগন্তুক।

টারজান কিন্তু কথা শেষ করে নি—"রানীর কাছে আমায় যেতে হবে কেন, সেইটি আমায় খুলে যদি বল, আর আমি যদি বুঝি সেখানে গেলে আমার কোন বিপদ হবে না, তাহলে সাঁতার দিয়েই আমি কূলে পৌঁছোতে পারি এখন। কাল রাত্রে এ নদীতে যে স্রোত আর যে ঢেউ ছিল, এখন তা নেই। সাঁতার দেওয়া এখন হয় ত সম্ভব হতে পারে আমার পক্ষে।"

লোকটা আবারও বোধহয় অবিশ্বাস করল টারজানের কথা। কিন্তু তারই কথার প্যাঁচে তাকে জব্দ করার মতলব নিয়ে বলল—"সম্ভব হয় যদি তবে চলে এস। আমার ভয়ানক তাড়া আছে। অ্যাথনির সৈন্য এসে পড়েছে সোমার সেতু পর্যন্ত। আমাদের এক্ষুণি সেজে বেরুতে হবে তাদের রুখবার জন্য। আমি তাই ওদের রণযাত্রার হুকুম দেবার জন্যই এসেছি এখানে। এই যে বাড়িটা, এটা হল সিংহের খোঁয়াড় একটা। একশো সিংহ এখানে থাকে, আর একশো রক্ষক। আমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক। যুদ্ধের সময় ওদের সবাইকে, মানুষ জন্তু সবাইকে, আমিই নিয়ে যাই যুদ্ধে।"

বেশ একটু আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতেই এই পরিচয়টুকু দিল আগন্তুক। একশো সিংহের তত্ত্বাবধায়ক যে মস্ত একটা পদমর্যাদার অধিকারী, সেইটাই প্রকাশ পেলো তার কথার সুরে।

"কিন্তু রানীর কাছে কেন আমায় যেতে হবে? সে কথা ত বলছ না?"—আবারও জানতে চায় টারজান।

আগন্তুক এবার বিরক্তই হল—"যেতে হবে দুই কারণে। প্রথমতঃ, আমাদের দেশের ঐ হল নিয়ম। বিদেশী কেউ এখানে এলেই রানীর কাছে তাকে হাজির করি আমরা। দ্বিতীয়তঃ, তুমি এসেছ অ্যাথনিদের তরফ থেকে একটা আক্রমণের প্রাক্কালে, এবং এসেই রানীর তিনটে সিংহ এবং দুটো সৈনিককে করেছ নিহত। এটাকে রানী গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচনা করবেন, না তুচ্ছ ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেবেন, সেটা নির্ভর করবে তাঁর সাময়িক মেজাজের উপরে।"

"এ সময়ে সে-মেজাজ খুব শরিফ থাকার কথা ত নয়!"—চিন্তিতভাবে জবাব দিল টারজান—"শিয়রে শত্রু নিয়ে কেউ হাসিখুশী থাকতে পারে না। আমার ব্যাপারটা রানী গুরুতর বলেই যদি বিবেচনা করেন, তাহলে তার দরুন তিনি বোধহয় আমাকে সিংহের মুখে নিক্ষেপ করবারই হুকুম দেবেন?"

এক গাল হেসে আগন্তুক বলল—"খুবই সম্ভব।"

"এ রকম একটা বীভৎস আশঙ্কা যেখানে রয়েছে, সেখানে আমি যাবই বা কেন?"

"না গিয়ে উপায় নেই বলে"—জবাব দেয় আগন্তুক।

যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি অবস্থাতেই দিল লাফ। [পৃষ্ঠা ৬৬৪

"উপায় নেই, তা নয়। তুমি আর তোমার লোকেরা এবং তোমাদের সিংহেরাও কিছু আর এখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারছ না। কারণ যুদ্ধ বেধেছে, রানীর কাছে তোমরা এত্তেলা করতে বাধ্য। ব্যস, তোমরা চলে গেলেই আমি কূলে উঠব, আর যেদিকে ইচ্ছে চলে যাব। চাই কি, অ্যাথনিওলাদের সঙ্গেও গিয়ে মিলতে পারি।"

"আমি এখানে পাহারা রেখে যা—"

"দুটো লোক তিনটে সিংহকে ঘায়েল করেছি আমি, আরও দুই চারজনকে—"

কথা শেষ করতে পারল না টারজান। আগন্তুক বলল—"আমি একটা পল্টনই রেখে যাব এখানে। অ্যাথান থেকে যারা আসবে, তাদের মোকাবিলার জন্য সিংহগুলোই বেশী দরকার আমাদের। পঞ্চাশটা মানুষ এখানে থেকে যায় যদি, ক্ষতি হবে না।"

টারজান হেসে বলল—"সেক্ষেত্রে আমি কূলেই উঠব না। জলে নেমে পড়ব।

সাঁতার দিয়ে চলে যাব সোনার সেতু পর্যন্ত। সেখানে কূলে উঠে—দেখছ ত! স্রোতের রেশ কমে এসেছে। এ-জলে নামলে এবার আর আমি ভেসে যাব না স্রোতে।"

আগন্তুক ধৈর্য হারাল, প্রথমতঃ তর্কাতর্কিতে সে অভ্যস্ত নয়। সে নয় শুধু, ক্যাথনিবাসী কেউই অভ্যস্ত নয় ওতে। তারা উপরওয়ালার হুকুম বিনা ওজরে তামিল করে, আর আশা করে যে নীচুওয়ালারাও তাদের হুকুম তামিল করবে বিনা ওজরে। দ্বিতীয়তঃ, তর্কের সময় এখন সত্যই নেই। যুদ্ধ আসন্ন। রানীর দরবারে এত্তেলা দিতে দেরি হবে যার, তার অদৃষ্টে দুঃখ আছে।

অসহিষ্ণু হয়ে সে বলে উঠল—"এত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজে নামে ভীরুরা। আমি ভেবেছিলাম তুমি সাহসী লোক—"

কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত বাঙ্‌নিষ্পত্তি করতে পারল না টারজান। তারপর সে করল এক কীর্তি। যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি অবস্থাতেই দিল লাফ। পড়ল গিয়ে বিশ ফুটের মাথায়। সেখানে তখন গলা-জল টারজানের, স্রোতের বেগ, গত রাত্রির মত দুর্বার না হলেও বেশ প্রবল এখনো! তবে ঢেউটা কমেছে। টারজানের মত অমিতশক্তি পুরুষের পক্ষে সে ঢেউ বা সে স্রোত কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নয়। সাঁতার তাকে দিতে হল না। সে পায়ে হেঁটেই কূলে গিয়ে উঠল—

আগন্তুক সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল। এমন নির্ভীক আচরণ সে প্রত্যাশা করেনি। টারজান যখন কূলে এসে উঠল, তখন এগিয়ে এসে সে হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে—"তুমি সত্যিই সাহসী পুরুষ। স্বীকার কর—তোমার দেশে বীর বলে প্রসিদ্ধি আছে তোমার।"

"তা আছে"—বলে গা ঝাড়া দিয়ে টারজান মাথার আর দেহের জল যথাসম্ভব ঝরিয়ে দিল—"চল এইবার, কোথায় তোমাদের রানী, দেখি। এখনও গোটাকতক তীর আছে আমার তূণে। ঠিক জেনো, রানীর বা অন্য কারও দিক থেকে আমার উপর কোন অত্যাচারের উপক্রম দেখলে প্রথম তীরে আমি জান নেব তোমার, দ্বিতীয় তীরে রানীর। আমার লক্ষ্য যে অব্যর্থ, তাতে সন্দেহ কর না। চাক্ষুষ দেখ—ঐ যে আকাশে উড়ে যাচ্ছে চিলটা—"

কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ একশো ফুট উপরে হাওয়ার রাজ্যে উড়ন্ত চিলকে লক্ষ্য করে তীর ক্ষেপণ করল টারজান, আর কথা শেষ হতে না হতেই একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ করে দিয়ে চিলটা পড়ে গেল মাটিতে। টারজান আর ভ্রূক্ষেপ করল না কোনদিকে। সোজা গিয়ে উঠল আগন্তুকের রথে।

"এই চামড়াখানা পরেই তুমি রানীর কাছে যেতে চাইছ নাকি?"

চিলের পর্ব চাক্ষুষ দেখার ফলে আগন্তুক নির্বাক্ হয়ে গিয়েছিল। এইবার নিরীহভাবে তার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল ঐ প্রশ্নটা।

"দোষ কী? লজ্জা নিবারণ ছাড়া পরিচ্ছদের আর কোন দরকার আমি বুঝি না। কিন্তু তোমার নাম কী? এদেশে এসে প্রথম পরিচয় হল যার সঙ্গে, তার নামটা জেনে রাখতে চাই। আমার নিজের নাম হল টারজান।"

"টারজান? চমৎকার নাম ত!"—বলল আগন্তুক—"আমার নাম জেমনন। একটা কথা বলি শোন। রানীকে রাগিয়ে দিও না। তাহলেই আমি তোমাকে জ্যান্ত বার করে আনতে পারব দরবার থেকে। আমাকে তুমি বন্ধু বলেই ভেব।"

টারজান হেসে বলল—"ধন্যবাদ। রানী তোমাদের খুব রাগী বুঝি?"

সিংহযান তখন চলতে শুরু করেছে। জেমনন মৃদুস্বরে বলল—"তা রাগী বইকি! খুবই রাগী মানুষ। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে খুব অনুরাগিণীও তাঁকে হয়ে পড়তে দেখেছি বইকি? তোমার সম্বন্ধে যেটুকু দেখেছি, তাতে আমার ত মনে হয় তুমি শেষের দলেই পড়বে।"

টারজান ত তা শুনে হেসেই অস্থির। তারপর হাসি থামিয়ে বলল—"দেখতে কেমন তোমাদের রানী?"

"অদ্ভুত! অদ্ভুত সুন্দরী হে! এমনটি দুনিয়ায় আর নেই।"　　(ক্রমশঃ)

কলিকাতার তনুপুকুর রোড নিবাসী শ্রীপ্রভাস-চন্দ্র বসু তাঁর স্বর্গতঃ পুত্র সিদ্ধার্থ বসুর পুণ্যস্মৃতি রক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"সিদ্ধার্থ বসু স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ঃ

আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রতিভা ন কিশোরের শোচনীয় মৃত্যু

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ঃ ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৮০। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা আগামী ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

প্রথম পুরস্কার পনের টাকা　ও　দ্বিতীয় পুরস্কার দশ টাকা

হাঁদা-ভোঁদার
ফাঁদ পাতা
এর ভেতর দিয়ে যাবো না হাঁদা! ভোঁদা একটা সাংঘাতিক কুকুর এনে রেখেছে!
কুকুর হইতে সাবধান
আরে দূর! আমি পরশুদিন দেখেছি। মোটা হদ্দ কুঁড়ে একটা। মাছি পর্যন্ত তাড়ায় না!
ঠিক আছে, তুই এতো ভয় পাচ্ছিস! কিন্তু আমি তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি ভয়ের কিছু নেই!
কিরে ব্যাটা কুমড়োপটাশ!
একি! কে আমাকে পা আটকে দিয়ে ফেলে দিলো
ঐ যে হতচ্ছাড়া! ঝোপের আড়ালে পা দেখতে পাচ্ছি!
এমন শিক্ষা দেবো, পায়ে আটকে আর কাউকে— আরে! এটা যে নকল মানুষ!

বাঁচাও! এ তো আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা!
এ্যাই, ওখানে কে আবার জলের পিপে নিয়ে কি করতে যাচ্ছে!
ছপাস!
উফ্! এবারে আমি বুঝতে পেরেছি!
ভোঁদা! ভেবেছিস তুই খুব চালাক? থাম তোকে আগে ধরি...
কোথায় লুকিয়েছিস রে হতচ্ছাড়া?
আঁ আঁ আঁফ্!
হাঃ হাঃ!
সপাৎ!
বাঁচাও!
কুকুর হইতে সাবধান
হাঁদা, মনে হচ্ছে তুই বলেছিলি কুকুরটা কামড়ায় না!
না কুকুর নয়—ভোঁদা হচ্ছে বিপজ্জনক!
ভোঁদা কুকুর হইতে সাবধান

অনিল ভৌমিক

৭

পরদিন ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দেখল—হাসান আর তার বন্ধু দু'জনেই চলে গেছে। ঘরে শুধু ও একা। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল—এবার কী করা যায়? কী করে প্রতিদিনের খাবার যোগাড় করবে, টাকা জমাবে, মকবুলকে খুঁজে বের করবে। দেশে তো ফিরতে হবে? তারপর নিজেদের একটা জাহাজ নিয়ে সোনার ঘন্টা খুঁজতে আসতে হবে। সঙ্গে আনতে হবে সব বিশ্বস্ত বন্ধুদের। কিন্তু সেসব তো পরের কথা। এখন কী করা যায়? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আচ্ছা মকবুলের সেই মস্ত বড় হীরের গল্পটা বাজারের কুয়োর ধারে বসে লোকদের শোনালে কেমন হয়? কত বিদেশী বণিকই তো বাজারে আসে। এমন কাউকে কি পাওয়া যাবে না যে গল্পটা আগে শুনেছে! তাহলেই মকবুলের খোঁজ পাওয়া যাবে। কারণ মকবুল ছাড়া এই গল্প আর কে বলবে? ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। এতক্ষণে বাজারে লোকজন আসতে শুরু করেছে নিশ্চয়ই। কুয়োর ধারে খেজুর গাছটার তলায় বসতে হবে এবার।

"সে এক প্রকাণ্ড হীরে—মদিনা মসজিদের গম্বুজের চেয়েও বড়—কী চোখ-ধাঁধানো আলো তার! দু' হাতে চোখ ঢেকে আমরা তো শুয়ে পড়লাম। সমস্ত গুহাটা তীব্র আলোর বন্যায় ভেসে যেতে লাগল।" ফ্রান্সিস গল্পটা বলে চলল। লোকেরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করে চলে গেল—"গাঁজাখুরী গপপ—অত বড়

হীরে হয় নাকি ?" কিন্তু বেশির ভাগ লোকই হাঁ করে গল্পটা শুনল। প্রথম দিন তো। ফ্র্যান্সিস খুব একটা গুছিয়ে গল্পটা বলতে পারল না। তবু লোকের ভালো লাগল। গল্প বলা শেষ হলে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে ফ্র্যান্সিসের হাতে কিছু মুদ্রা দিল। দেখাদেখি আরো কয়েকজন কিছু মুদ্রা দিল। ফ্র্যান্সিস মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। যাক, প্রাণে বেঁচে থাকার একটা সহজ উপায় পাওয়া গেল। গল্প বলে যদি এইরকম রোজগার হয় তাহলে খাওয়ার ভাবনাটা অন্ততঃ মেটে।

পরের দিন থেকে ফ্র্যান্সিস আরো গুছিয়ে গল্পটা বলতে লাগল। কয়েকদিনের মধ্যেই সে বেশ ভালো গল্প-বলিয়ে হয়ে গেল। গল্পটাকে আরো বাড়িয়ে, আরো নানারকম রোমহর্ষক ঘটনা যোগ করে লোকদের শোনাতে লাগল। রোজগারও হতে লাগল। কিন্তু এত দিনে এমন কাউকে পেল না যে গল্পটা আগে শুনেছে। তবু ফ্র্যান্সিস হাল ছাড়ল না। প্রতিদিন গল্পটা বলে যেতে লাগল। সেই বাজারের কুয়োটার ধারে, খেজুর গাছটার নীচে বসে।

একদিন ফ্র্যান্সিস গল্পটা বলছে—"সব সময় নয়, যখন সূর্যের আলো সরাসরি গুহাটায় এসে পড়ে তখনি দেখা যায় আলোর খেলা, কত রঙের আলো—"

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল—এ গল্পটা আমার শোনা।

ফ্র্যান্সিস গল্প বলা থামিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিদেশী ব্যবসায়ী। ফ্র্যান্সিস জিজ্ঞেস করল—কোথায় শুনেছেন গল্পটা ?

—হায়াৎএর এক সরাইখানায়।

—যে লোকটা গল্পটা বলেছে তার নাম জানেন ?

—না, সে নাম বলে নি।

—দেখতে কেমন ?

—মোটাসোটা গোলগাল, বেশ হাসিখুশী।

ফ্র্যান্সিসের আর বুঝতে বাকী রইল না—লোকটা আর কেউ নয়, মকবুল। কিন্তু হায়াৎ ? সে তো অনেকদূর। তিন চারদিনের পথ। উটের ভাড়া গুনবে, সে ক্ষমতা তো ওর নেই। এদিকে শ্রোতারা অস্বস্তি প্রকাশ করতে লাগল। গল্পটা শেষ হল না। ফ্র্যান্সিস ফিরে এসে আবার গল্পটা বলতে লাগল।

কিছুদিন যেতেই কিন্তু গল্পটা লোকের কাছে পুরোনো হয়ে গেল। কে আর একই গল্প প্রতিদিন শুনতে চায় ? বিদেশী বণিক-ব্যবসায়ী যারা আসত তারাই যা দুচারজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে শুনত। ফ্র্যান্সিস ভেবে দেখল—রোজগার বাড়াতে হলে আরও লোক জড়ো করতে হবে। নতুন গল্প শোনাতে হবে। এবার তাই সে সোনার ঘণ্টার গল্পটা বলতে শুরু করল। চারদিকে ভীড় করে দাঁড়ানো শ্রোতাদের উৎসুক মুখের দিকে

তাকিয়ে ফ্র্যান্সিস সুন্দর ভঙ্গীতে গল্পটা বলতে থাকে—"নিশুতি রাত। ডিমেলোর গীর্জার পেছনে ঘন জঙ্গলে আগুনের আভা কিসের? সোনা গলানো চলছে। বিরাট কড়াইতে সোনা গলিয়ে ছাঁচে ফেলা হচ্ছে। কেন না, সোনার ঘণ্টা তৈরী হবে। কবে তৈরী শেষ হবে? ডাকাত পাদরীরা সোনা গলায় আর ছাঁচে ঢালে।" খুব জমে যায় গল্পটা। শ্রোতারা অবাক্ হয়ে সোনার ঘণ্টার গল্প শোনে। কেউ কেউ মন্তব্য করে—"যত সব বাজে গল্প।" চলেও যায় কেউ কেউ। কিন্তু নতুন লোক জড়ো হয় আরো বেশী। এক সময় গল্পটা শেষ হয়। শ্রোতাদের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্র্যান্সিস বলে—সেই সোনার ঘণ্টা এখনও আছে, এই সমুদ্রের কোন অজানা দ্বীপে। তোমরা ভাই খুঁজে দেখতে পার।

গল্প শেষ। শ্রোতাদের ভিড় কমতে থাকে। ফ্র্যান্সিস হাত পাতে। যাবার আগে অনেকেই কিছু কিছু সুলতানী মুদ্রা হাতে দিয়ে যায়। গল্পটা শুনে সবাই যে খুব খুশী হয়েছে—এটা ফ্র্যান্সিস বোঝে। ও আরও উৎসাহ পায়, কিন্তু বিপদ হল এই গল্পটা বলতে গিয়েই।

জোব্বাপরা নিরীহগোছের লম্বামত চেহারার একজন লোক মাঝে মাঝে ফ্র্যান্সিসের পেছনে দাঁড়িয়ে গল্প শুনত। ফ্র্যান্সিস যেদিন থেকে প্রথম সোনার ঘণ্টার গল্পটা বলতে লাগল সেদিন থেকে লোকটা প্রত্যেক দিন আসতে লাগল। অনেকেই গল্প শুনতে জড়ো হয়। সবাইকে তো আর মনে রাখা যায় না। ফ্র্যান্সিস আপন মনে গল্পই বলে যায়।

একদিন ফ্র্যান্সিস যেই গল্পটা শেষ করেছে, পেছন থেকে লোকটা জিজ্ঞেস করল—তুমি সেই সোনার ঘণ্টা দেখেছ?

ফ্র্যান্সিস পেছন ফিরে লোকটাকে দেখল। গোবেচারাগোছের চেহারা। রোগা আর বেশ লম্বা। ফ্র্যান্সিস ওকে আমলই দিল না। হাত বাড়িয়ে শ্রোতাদের দেওয়া মুদ্রাগুলো নিতে লাগল।

—সেই সোনার ঘণ্টা তুমি দেখেছ? লোকটা একই সুরে আবার করল প্রশ্নটা।

—না? ফ্র্যান্সিস বেশ রেগেই বলল।

—সেই ঘণ্টার বাজনা শুনেছ?

—তোমার কী মনে হয়?

—আমার মনে হয় তুমি সব জান।

ফ্র্যান্সিস এবার অবাক্ চোখে লোকটার দিকে তাকাল। ঠাট্টা করে বলল—সবই যদি জানব তাহলে কি আর এখানে গল্প বলে ভিক্ষে করি?"

—তুমি নিশ্চয়ই জান সেই সোনার ঘণ্টা কোথায় আছে।

ফ্র্যান্সিস ওকে থামিয়ে দিতে চাইল। বিরক্তির সুরে বলল—"বারে, গল্প গল্পই—

গল্পের ঘণ্টা সোনারই হোক আর রুপোরই হোক, তাকে চোখেও দেখা যায় না—তার বাজনাও শোনা যায় না।

হঠাৎ লোকটা পরনের জোব্বাটা কোমরের একপাশে সরাল। ফ্র্যান্সিস দেখল—তরোয়ালের হাতল। লোকটা একটানে খাপ থেকে তরোয়ালটা খুলে ফেলল। তারপর চকচকে তরোয়ালের ডগাটা ফ্র্যান্সিসের থুতনির কাছে চেপে ধরে গম্ভীর গলায় বলল—আমার সঙ্গে চল।

নিরীহ চেহারার মানুষটা যে এমন সাংঘাতিক, ফ্র্যান্সিস আগে সেটা কল্পনাও করতে পারেনি। কয়েক মুহূর্ত ও অবাক্ হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। টুকটাক কথা থেকে একেবারে থুতনিতে তরোয়াল ঠেকান! আজকে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।

—চল। লোকটা তাড়া লাগাল।

—কোথায়?

—গেলেই দেখতে পাবে।

এ আবার কোন্ ঝামেলায় পড়লাম! কিন্তু উপায় নেই। লোকটা যেমন তেরিয়া হয়ে আছে গাঁইগুঁই করলে হয়তো গলায় তরোয়ালই চালিয়ে দেবে।

—বেশ চল। ফ্র্যান্সিস হতাশার ভঙ্গী করে বলল।

ফ্র্যান্সিস লোকটার নির্দেশমত বাজারের পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। লোকটা খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে ঠিক ওর পেছনে পেছনে যেতে লাগল।

পথে যেতে যেতে ফ্র্যান্সিস কোন্‌দিকে যেতে হবে তা বুঝতে না পেরে মাঝে মাঝে থেমে পড়ছিল—লোকটা ওর পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে পথ দেখিয়ে দিতে লাগল। ফ্র্যান্সিস মনে মনে কেবল পালাবার ফন্দি আঁটতে লাগল। কিন্তু পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারল, লোকটা ভীষণ সতর্ক। একটু এদিক ওদিক ওর পা পড়লেই লোকটা ধমক দিচ্ছে—সোজা হাঁট। পালাবার চেষ্টা করলে মরবে। ফ্র্যান্সিস আবার সহজ ভাবে হাঁটতে লাগল। এবার একটা খুব সরু গলি দিয়ে যেতে লাগল ওরা।

হাত বাড়ালেই বাড়ির দরজা, এত সরু গলি সেটা। ফ্র্যান্সিস নজর রাখতে লাগল কোন খোলা দরজা পায় কি না। পেয়েও গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে ফ্র্যান্সিস বসে পড়ল। লোকটা তরোয়াল নামিয়ে ওর গায়ের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল—কী হল?

ফ্র্যান্সিস এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, তড়িৎগতিতে মাথা দিয়ে লোকটার পেটে একটা গুঁতো মারল। লোকটা আচমকা গুঁতো খেয়ে টাল সামলাতে পারল না, সেই পাথুরে গলিটায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ফ্র্যান্সিস আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। বাঁদিকের

খোলা দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপরেই ছুটল ভিতরের ঘরের দিকে। বোঝাই যাচ্ছে গৃহস্থ বাড়ি, কিন্তু লোকজন কেউ নেই সে ঘরে। পাশের একটা ঘরে লোকজনের কথাবার্তা শোনা গেল, বোধহয় ওঘরে খাওয়া-দাওয়া চলছে। হঠাৎ ফ্র্যান্সিসের নজরে পড়ল দেয়ালে একটা বোরখা ঝুলছে। যাক আত্মগোপনের একটা উপায় পাওয়া গেল। ফ্র্যান্সিস তাড়াতাড়ি বোরখাটা পরে নিল, তারপর এক ছুটে ভিতরের উঠোনে চলে এল। দেখল ছাদটা বেশী উঁচু নয়। জানলার গরাদেতে পা রেখে রেখে তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে পড়ল। তারপর ছাদের উপর ছাদ লাফিয়ে লাফিয়ে পার হতে হতে বেশ দূরে চলে এল। এবার নামা যেতে পারে। এই জায়গায় ফ্র্যান্সিস মারাত্মক ভুল করল। আগে থেকে দেখে নিল না গলিটা ফাঁকা আছে কিনা। কাজেই লাফ দিয়ে পড়বি তো পড়, একটা লোকের নাকের ডগায় এসে পড়ল। লোকটা বোধহয় গানটান করে। আপন মনে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে যাচ্ছিল। একটা বোরখা পরা মেয়ে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল দেখে তো ওর গান বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা মুখ হাঁ করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ফ্র্যান্সিস তার আগেই ওর ঘাড়ে এক রদ্দা মারল। ব্যস! লোকটার মুখ দিয়ে আর টুঁ শব্দটি বেরুল না। সে বেচারা কলাগাছের মত ধপাস করে পড়ে গেল।

ফ্র্যান্সিস দ্রুতপায়ে ছুটল গলিপথ দিয়ে। একটু পরেই একটা ফাঁকা জায়গায় এল। সেখানে একটা পাতকুয়ো। কুয়োটার ওপরে কপিকল লাগান। দড়ি দিয়ে চামড়ার থলিতে করে মেয়েরা জল তুলছে। কুয়োটার চারপাশে বোরখা পরা মেয়েদের ভিড়। সবাই জল নিতে এসেছে। ফ্র্যান্সিসও সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু হলে হবে কি? সেদিন ফ্র্যান্সিসের কপালটা সত্যিই মন্দ ছিল। সে তখনও জানত না সমস্ত এলাকাটাই সুলতানের সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে।

বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশী, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। একটু পরেই সুলতানের সৈন্যরা কুয়োতলায় এসে হাজির। কুয়োতলার চারপাশের বাড়িতে তল্লাশী শেষ হল। ঠিক তখনই সৈন্যরা একজন লোককে ধরে নিয়ে এল। লোকটা হাত মুখ নেড়ে কী যেন বলতে লাগল। বোরখার আড়াল থেকে ফ্র্যান্সিস সবই দেখছিল। সে লোকটাকে চিনতে পারল। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে সে এই লোকটার সামনেই এসে পড়েছিল। এবার আর রক্ষে নেই। সৈন্যদের দলনেতা চিৎকার করে কী যেন হুকুম দিল। সব সৈন্য দল বেঁধে তরোয়াল উঁচিয়ে কুয়োতলার দিকে আসতে লাগল। মেয়েরা ভয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। সৈন্যদের নেতা হাত তুলে অভয় দিল। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। দু তিনজনের জলের পাত্র ভেঙে গেল। যে যেদিকে পারল পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সৈন্যরা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতে লাগল। ফ্র্যান্সিস দেখল এই সুযোগ।

ফ্র্যান্সিস কুয়োতলার পাথর বাঁধানো চত্বর থেকে এক লাফ দিয়ে নেমেই ছুটল সামনের বাড়িটা লক্ষ্য করে। দরজার কাছে পৌঁছেও গেল। কিন্তু—শন্—ন্—ন্ একটা ছুরি ওর কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। ছুরিটা সামনের কাঠের দরজায় গভীর হয়ে বিঁধে গিয়ে কাঁপতে লাগল। একটুর জন্যে ওর ঘাড়ে লাগেনি।

—পালাবার চেষ্টা কর না। পেছন থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল। ফ্র্যান্সিস আর নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল। ওর গা থেকে কে যেন বোরখাটা খুলে নিল। ফ্র্যান্সিস দেখল সেই রোগা লম্বামত লোকটা। লোকটা হেসে বলল—আর হেঁটে নয় —এবার ঘোড়ায় চেপে চল।

ছুরিটা সামনের কাঠের দরজায় গভীর হয়ে বিঁধে গেল।

ফ্র্যান্সিসের আর পালান হল না।

ফ্র্যান্সিসকে রাখা হল মাঝখানে। চারপাশে সৈন্যদল ওকে ঘিরে নিয়ে চলল। ওর পাশেই চলল সেই রোগা লম্বামত লোকটা। আমদাদের পাথর বাঁধানো রাজপথে অনেকগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল। ওরা চলল সদর রাস্তা দিয়ে। ফ্র্যান্সিস তখনও জানতে পারেনি তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেনই বা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ও সব কিছু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল, তবু কৌতূহল যেতে চায় না। ব্যাপারটা কী? ওকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন?

সৈন্যদলের সঙ্গে ফ্র্যান্সিসও এগিয়ে চলল। আড়চোখে একবার লম্বামত লোকটাকে দেখে নিল। লোকটা নির্বিকার। কোন কথাও বলছে না। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্র্যান্সিস এবারে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

—গেলেই দেখতে পাবে। লোকটা শান্ত স্বরে বলল।

—তবু আগে থেকে জানতে ইচ্ছে করে।

—সুলতানের কাছে।

ফ্র্যান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল। বলে কি! দেশের সুলতান! দোর্দণ্ডপ্রতাপ তাঁর। ফ্র্যান্সিসের মত নগণ্য একজন বিদেশীর সঙ্গে কী সম্পর্ক তাঁর?

—কিন্তু আমার অপরাধ?

—সোনার ঘণ্টার হদিস তুমি জান।

—আমি কিছুই জানি না।

—সুলতানকে তাই বলো। এখন বকবক বন্ধ কর, আমরা এসে গেছি।

বিরাট প্রাসাদ সুলতানের। ফ্র্যান্সিস প্রাসাদটা দেখেছে আগে, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে। আজকে প্রাসাদে ঢুকছে। স্বপ্নেও ভাবেনি কোনদিন সে এই প্রাসাদে ঢুকবে।

মস্তবড় খিলানঅলা দেউড়ি পেরিয়ে অনেকটা ফাঁকা পাথর বাঁধানো চত্বর। চত্বরটায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল—ঠক্ ঠক্—। এক কোনার দিকে ঘোড়াশাল। সেখানে ঘোড়া থেকে নামল সবাই।

এবার সামনে সেই লম্বামত লোকটা চলল। তারপর ফ্র্যান্সিস। পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে দু'জন সৈন্য। ওরা প্রাসাদের মধ্যে ঢুকল।

বিরাট বিরাট দরজা—ঘরের পর ঘর পেরিয়ে চলল ওরা। সবগুলো ঘরই সুসজ্জিত। দামী কার্পেটে মোড়া মেঝে। রঙীন কাঁচ বসানো শ্বেতপাথরের দেয়াল। এখানে ওখানে সোনালী রঙের কাজকরা লতাপাতা ফুল। লাল টকটকে গদিতে মোড়া ফরাস, বসবার জায়গা। বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে ছাদ থেকে। দরজা জানালা মীনে করা। সুন্দর কারুকাজ তাতে। দরজায় দরজায় ঝকঝকে বর্শা হাতে দ্বাররক্ষীরা দাঁড়িয়ে আছে। লম্বামত লোকটাকে দেখেই ওরা পথ ছেড়ে দিতে লাগল।

একটা ঘরে ঢুকে লোকটা হাততালি দিল। সৈন্য দু'জন দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা আর ঘরে ঢুকল না। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরটা অন্য ঘরের তুলনায় ছোট। মাঝখানে লাল গদিমোড়া বাঁকানো পায়ার টেবিল। দু পাশের বসবার জায়গাগুলোও লাল গদিমোড়া। দেয়ালে, দরজায়, জানালায় অন্য ঘরগুলোর চেয়ে বেশী কারুকাজ। লোকটা ফ্র্যান্সিসকে বসতে ইঙ্গিত করল। ফ্র্যান্সিস

বসল। লোকটা ভেতরের দরজা দিয়ে কোথায় চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। কেমন সন্ত্রস্ত ভঙ্গি। ফ্র্যান্সিসের কাছে এসে মৃদুস্বরে বলল—সুলতান আসছেন—উঠে দাঁড়িয়ে আদাব করবে।

ভেতরের দরজা দিয়ে সুলতান ঢুকলেন। ফ্র্যান্সিস সুলতান রাজবাদশাহদের কাহিনী শুনেছেই এতদিন। চোখে দেখে নি কোনদিন। আজকে প্রথম দেখল। সুলতান বেশ দীর্ঘদেহী, গায়ের রঙ যেন দুধেআলতায় মেশান। দাড়ি গোঁফ সুন্দর করে ছাঁটা। মাথায় আরবীদের মতই বিড়েবাঁধা সাদা দামী কাপড়ের টুকরো। তবে পরনে জোব্বা নয়, একটা আঁটোসাঁটো পোশাক। তাতে সোনা দিয়ে লতাপাতার কাজ করা। বুকে ঝুলছে একটা মস্তবড় হীরে বসানো গোল লকেট। গলায় মুক্তোর মালা। সুলতানকে দেখেই লম্বামত লোকটা মাথা নুইয়ে আদাব করল। লোকটার দেখাদেখি ফ্র্যান্সিসও আদাব করল। সুলতান ফ্র্যান্সিসকে বসতে ইঙ্গিত করে নিজেও বসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন —তোমার নাম কী ?

—ফ্র্যান্সিস।

ফ্র্যান্সিস এতক্ষণে ভাল করে সুলতানের মুখের দিকে তাকাল। সুলতানের চোখের দৃষ্টিটা ফ্র্যান্সিসের ভাল লাগল না। কেমন যেন ক্রূরতা সেই দৃষ্টিতে। বড় বেশী স্থির, মর্মভেদী।

—তুমি বাজারে গল্প বল—সোনার ঘণ্টার গল্প ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—মানে পেটের দায়ে—

—গল্পটা কোথায় শুনেছ ?

—দেশে—বুড়ো নাবিকদের মুখে।

—তোমার কী মনে হয় ? গল্পটা সত্যি না মিথ্যে ?

—কী করে বলি ? তবে সত্যি হতেও পারে।

সুলতানের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। বললেন—ও কথা বলছ কেন ?

—আমি সেই সোনার ঘণ্টার বাজনা শুনেছি।

সুলতান ক্রূর হাসি হাসলেন, বললেন—শুধু বাজনা শোনা নয়, একমাত্র তুমিই জান সেই সোনার ঘণ্টা কোথায় আছে, কেমন করেই বা ওখানে যাওয়া যায়।

ফ্র্যান্সিস সাবধান হল। বেফাঁস কিছু বলে ফেললে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। বলল—বিশ্বাস করুন সুলতান, আমি এসবের বিন্দুবিসর্গও জানি না।

—তুমি নিজের চোখে সোনার ঘণ্টা দেখেছ। সুলতান দাঁত চেপে কথাটা বললেন।

ফ্র্যান্সিস চমকে উঠল। বুঝল—ভীষণ বিপদে পড়েছে সে। এমন লোকের খপ্পরে পড়েছে যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যে যাই বলুক না কেন, যতই বোঝাবার চেষ্টা করুক না কেন—সুলতান কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করবেন না। তবু ফ্র্যান্সিস বোঝাবার চেষ্টা করল—সুলতান—আমি বললাম তো, সোনার ঘণ্টার বাজনা আমি শুনেছি। তখন প্রচণ্ড ঝড়ে আর ডুবো পাহাড়ের ধাক্কায় আমাদের জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল। তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্তকর অবস্থা। কোত্থেকে বাজনার শব্দটা আসছে, কতদূর সেটা, এসব ভাববার সময় কোথায় তখন ?

—মিথ্যেবাদী ফেরেববাজ। সুলতান গর্জন করে উঠলেন। তারপর আঙুল নেড়ে লম্বামত লোকটাকে কী যেন ইশারা করলেন। লোকটা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ফ্র্যান্সিসের পিঠে ধাক্কা দিল—চল।

ঘরের বাইরে আসতেই সৈন্য দু'জন ফ্র্যান্সিসের দু'পাশে এসে দাঁড়াল। আবার যাত্রা শুরু হল। দু'পাশে সৈন্য দু'জন, সামনে সেই লোকটা। ফ্র্যান্সিস ভেবেই পেল না, তাকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? (ক্রমশঃ)

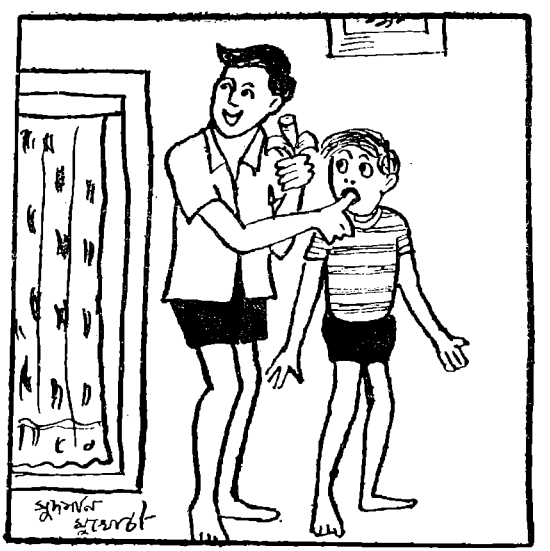

—ভাইকে কলার ভাগ দিয়েই খাচ্ছি—মা…

বিভূতিভূষণ ও বালক কবি

হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু বৎসর পূর্বের কথা, সন তারিখ ঠিক মনে নেই। আমি পথের পাঁচালীর অমর লেখক স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে তাঁর সাহিত্যিক জীবনে প্রবেশ লাভের একটা আশ্চর্য ঘটনা শুনেছিলাম, আজ শুকতারার পাঠক পাঠিকাদের কাছে সেই আশ্চর্য ঘটনাটিই বলছি।

বি-এ পাস করে বিভূতিভূষণ নদীয়ার একটা গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করতে এলেন। গ্রামের একটি ছেলেকে সবাই বালক কবি বলে ডাকত। তার ছড়া ও কবিতা লেখার হাত ছিল। এ-হেন বালক কবি একবার ঠিক করল সে একটি মাসিক পত্রিকা বের করবে। গ্রামে তাদের ছিল একটা ছাপাখানা।

বিভূতিভূষণ তখন পর্যন্ত এক লাইনও লেখেন নি, তিনি কোনদিন সাহিত্যিক হবেন—একথা স্বপ্নেও ভাবেন নি। বালক কবি একদিন হঠাৎ বিভূতিভূষণের কাছে এসে হাজির। বলল—বিভূতিদা, আপনাকে আমার কাগজে গল্প দিতে হবে। শুনে তো বিভূতিভূষণ একটু অবাক্ হলেন। বললেন—আমি লিখতেই পারিনে, লেখা দেব কি করে? কবি বলল—আপনি কলম ধরলেই পারবেন। বিভূতিভূষণ আশ্চর্য হয়ে বালক কবির দিকে তাকালেন।

একদিন দেখা গেল গ্রামের চারদিকে ছাপান বড় বড় পোস্টার পড়েছে। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা :

বাহির হইল ! বাহির হইল !!

বিভূতিভূষণের উপন্যাস।

বিভূতিভূষণের চোখেও পড়ল। জানা গেল এটা বালক কবির কাজ। তিনি বালক

কবিকে রেগে বললেন—এ তুমি করেছ কি? আমি জীবনে কোনদিন একবর্ণও লিখলাম না, আর তুমি আমার উপন্যাস বার করে দিলে?

কবি বলল—আপনার ভেতরে শক্তি আছে, আপনি কলম ধরলেই পারবেন। কিন্তু বালক কবির পক্ষে মাসিক পত্রিকা আর বের করা হল না। কিছুদিন কেটে গেল।

একদিন বিভূতিভূষণ ভাবলেন—আচ্ছা দেখাই যাক না লিখতে পারি কিনা। তিনি কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই বেশ একটা গল্প লিখে ফেললেন। নাম দিলেন—উপেক্ষিতা। তারপর তিনি একদিন কোন কাজে কলকাতায় এলেন। এই সুযোগে মাসিক প্রবাসী পত্রিকার অফিসে সম্পাদকের হাতে গল্পটিও দিলেন। কিছুদিন পরে গ্রামের ঠিকানায় তিনি এই মর্মে একটি চিঠি পেলেন:

আপনার 'উপেক্ষিতা' গল্পটি মনোনীত হয়েছে। ভবিষ্যতে আমাদের কাগজে এইরূপ আরও গল্প পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

বিভূতিভূষণ আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন, চিঠিখানা পেয়ে খুবই উৎসাহিত হলেন। যথাসময়ে 'উপেক্ষিতা' প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল এবং এজন্য তিনি আট টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। এর পর থেকেই তিনি নিয়মিত লিখতে আরম্ভ করলেন। প্রবাসীতে পর পর তাঁর কয়েকটি গল্প ছাপা হয়েছিল এবং পরে নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিভূতিভূষণ বাংলার সাহিত্যাকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে দেখা দিলেন ৺উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের পর।

আজ বিভূতিভূষণও নেই, বালক কবিও নেই, বিভূতিভূষণের এই বালক কবি অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে।

কুতুর চ্যালেঞ্জ

তোমায় একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে যদি বুড়ো আঙ্গুলের পিঠে ছবির মত সোজা দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় তাহলে তুমি চ্যালেঞ্জ নেবে কি?

চেষ্টা করেই দেখ না। না পারলে সমাধানটা ৬৮৩ পৃষ্ঠায় দেখে নাও।

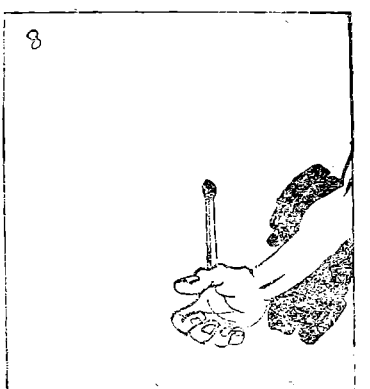

"মৌবুরী স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

ফলন্ত ব্যাটারী

শ্রীঅদিতিকিশোর সরকার

সে এক মহাযুদ্ধের কথা! কোন্ মহাযুদ্ধ, কোন্ সময় এবং কাহিনীর পটভূমিকা কী—সমস্ত গোপন রেখেই এ কাহিনী আরম্ভ করছি।

গ্রামের শেষ প্রান্তে দু'পাশে বালির চর সৃষ্টি করে স্বচ্ছ জলের স্রোত বহন করে চলেছে শীর্ণকায় খাল নবরত্না। তার অপর পাড়ে লোকবসতি নেই; আছে কেবল মাঠের পর মাঠ। খালের খুব কাছাকাছি কিছু শীতলপাটি গাছের ঝোপ ছাড়া দূরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে সবুজ শস্যক্ষেত্র। দিক্চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত সেই মাঠের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি বড় আকারের এবং চ্যাপ্টা ধরনের ঢিপি। দূর থেকে দেখে মনে হয়, ওই ঢিপিটি শাসনকর্তার মতো কঠোর হস্তে সমস্ত মাঠটিকে শাসন করছে। ঢিপির ওপর যে কিছুটা জমি আছে, তাও কিন্তু অনাবাদী অবস্থায় পড়ে নেই। গ্রামের কোন চাষী সেখানে পাতিলেবুর বাগান করেছে। বাগান থেকে প্রচুর পাতিলেবু শহরে চালান যায়। খালের ওপর যে বাঁশের সেতুটা রয়েছে সেখান থেকে একটা সংকীর্ণ রাস্তা মাঠের বুক চিরে ঢিপির ওপর দিয়ে ওপারে চলে গেছে।

বহুদিন থেকে প্রকৃতির সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে গ্রামবাসীরা সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। সুজলা-সুফলা মাঠ তাদের সারা বৎসরের খোরাক জোগাতো। কিন্তু সম্প্রতি ক্ষমতার লড়াইয়ে পৃথিবীর বড় বড় দেশের মধ্যে যে মহাযুদ্ধ বেধেছে, তার ফল ভোগ করছে গ্রামের মানুষেরা। গ্রামের জন-জীবন পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে যুদ্ধের বিভীষিকায়। যে শ্যামল মাঠ গ্রামবাসীর চোখ ও মন দুই-ই মুগ্ধ করতো, সেই মাঠ আজ সেনানিবাসে রূপান্তরিত হয়েছে। ফসলের মনোহর রূপ কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়েছে। এসব সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা কিছুটা শান্তিতে থাকতে পারতো, যদি সমস্ত রাত বোমা না পড়তো।

ব্যাপারটা এই,—সৈন্যদের কঠোর সতর্কতা সত্ত্বেও প্রতিদিন সেই মাঠে অর্থাৎ বর্তমান সেনানিবাসে রাত্রিবেলা বোমা পড়ে। রাত্রিবেলা কেউ আলো জ্বালায় না। তাই কমাণ্ডার ভেবে পান না—কি করে শত্রুপক্ষ তাঁদের অবস্থানের কথা জানতে পারে। চারিদিকে কড়া পাহারা। শুধু দিনের বেলা মাঝে মাঝে চাষীরা তাদের অবশিষ্ট ফসল মাঠে মাঠে ঘুরে

দেখে, আবার কড়া পাহারায় বেরিয়ে যায়। এই অবস্থায় শত্রুপক্ষের গুপ্তচর ওখানে ঢুকবে কি করে, আর রাত্রে আলোর সংকেতই বা দেবে কি করে?

কমাণ্ডার হরগোবিন্দ সাহানি কয়েকজন কর্মচারী নিয়ে এই ব্যাপারে তদন্তের জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন হদিস পেলেন না। সমস্ত মাঠ এবং পাতিলেবুর বাগান তারা তন্নতন্ন করে খুঁজলো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সৈন্যদের মধ্যে একজন একটা ঝোপের নীচে এক পাগলকে দেখতে পেলো। সে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু যখনি ওদের চোখে ধরা পড়লো, তখনি মারমূর্তি হয়ে ছুটে এল; একবার হাসে, একবার কাঁদে। অনেকেই তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলো, কিন্তু কমাণ্ডারের আদেশে তাকে গ্রেফতার করে তার জিনিসপত্র সার্চ করা হলো। দেখা গেল—একটা নোংরা কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে কিছু জড়ানো তামা ও দস্তার তার, কিছু ভাঙ্গা টর্চ-ব্যাটারীর মধ্যেকার গ্যাস-কার্বনের রড, একটা দুমুখ বন্ধ কাঁচের চোঙ আর গাদাখানেক ছেঁড়াখোঁড়া কাগজ ও নোংরা ন্যাকড়া। সবগুলো এমনভাবে মিশে আছে যে, সাধারণ লোক এগুলোকে ডাস্টবিন ছাড়া আর কোথাও রাখতে পারে কিনা সন্দেহ। পাগলাটাকে জেরা করে কিছুই জানা গেল না। সে কেবল আবোল-তাবোল বকে, অদ্ভুত কাজ করে বসে। কোন সৈন্যের গা শোঁকে, কারো জুতো চেটে দেয়। শেষে বিরক্ত হয়ে কমাণ্ডার তাকে বিদেয় করে দিলে, সে আবার আগের জায়গায় গিয়ে বসে পড়লো। সেদিন রাত্রেও এরোপ্লেন থেকে বহু বোমা পড়লো।

পরদিন যথারীতি কৃষকেরা সৈন্যদের পাহারার মধ্যে তাদের ক্ষেত দেখতে এসে ঘুরে ঘুরে সব দেখলে। পাতিলেবুর বাগানটা ছিল এক মুসলমান চাষীর; নাম তার জাহিদুল হোসেন। সে তার বাগান ঘুরে এসে যেন হতাশ হয়ে পড়লো। জানালো যে, এবার তাকে মাঠে মারা পড়তে হবে! দু'দিন পরে তার শহরে লেবু চালান দেবার কথা, আর এখনি কিনা এই শোচনীয় অবস্থা! সে তো বসে কপালে করাঘাত করতে লাগলো। ব্যাপার দেখে একজন সৈনিক কর্মচারী তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। উত্তরে সে জানালে যে, বাগানের প্রায় অর্ধেকের বেশী গাছের লেবু পচে কালো হয়ে গেছে। সে সঙ্গে করে কতকগুলো লেবু নিয়েও এসেছিল। সবাইকে সে ওগুলোর মধ্যে কি একটা বিশেষ চিহ্ন দেখাতে লাগলো। প্রত্যেকে দেখলো যে, প্রতিটি লেবুর মধ্যে দুটো করে ছিদ্র করা। পোকা সন্দেহে প্রত্যেকটি লেবু কাটা হলো, কিন্তু কোথাও পোকার চিহ্নমাত্র নেই। জাহিদুল হোসেন তো মাথায় হাত দিয়ে বসলো; এরকম হলে সে সারা বছর ছেলে-পুলেদের খাওয়াবে কি? সৈনিকটি তাকে কিছু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। জাহিদুলের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো সৈন্যদের ওপর। সে ক্ষোভের সঙ্গে বললে—"আপনাদের জন্যই

তো এমনটি হলো বাবু। আপনারা আছেন বলে এখানে বোমা পড়ে। আর বোমা পড়েই তো আমার লেবু বাগানের এমন ক্ষতি হলো।"

—"আরে না, না, ও তোমার মিথ্যে ধারণা। বোমার জন্যে লেবু নষ্ট হয়নি। অন্য কোন কারণে···," কর্মচারী বোঝাতে চেষ্টা করেন।

জাহিদুলের রাগ কিছুটা কমে এলো। সে শান্ত স্বরে বললে,—"সে যাই হোক বাবু, ক্ষেতি যে কারণেই হোক, কিন্তু বোমা পড়ে পড়ে যে বাগানের আর কিছু রইলনি।" একটু থেমে আবার বললে—"আচ্ছা, আপনারা হাওয়াই জাহাজ থেকে বোমা ফেলা বন্ধ করতে পারেন না?"

—"শত্রুরা ফেলে যাচ্ছে। আমাদের যা করবার, তা তো করছিই। সব আলো নিবিয়ে দিই রাত্রে, তাতেও যদি···"

—"বলেন কি বাবু, সব আলো নিবিয়ে দেন!"

—"হ্যাঁ সব, আলো।"

—"কিন্তু বাবু, আমরা যে রোজ রাত্তিরে আমার বাগানের মধ্যে থেকে লাল আলো দেখতি পাই।"

—"বলো কি? কই, আমাদের চোখে তো কোনদিন ও আলো পড়েনি।"

—"এদের জিজ্ঞেস করুন না বাবু।"—জাহিদুল কিছুক্ষণ বিমূঢ় বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে থাকে। ওর চোখ দুটো শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কম্পিত স্বরে বলতে থাকে,—"তবে কি, তবে কি ওটা তেনাদের আলো? আমার বাগানে কি শেষে ওনারা আড্ডা গাড়লো! হায় আল্লা!!"

আশান্বিত দৃষ্টিতে কর্মচারী জিজ্ঞেস করে,—"কাদের কথা বলতে চাও তুমি,—সব খুলে বল।"

—"ওই তেনাদের কথা বাবু। বুঝতি পারতিছেন না? রাত্তির বেলা যাদের নাম করতে নেই।"

কর্মচারী বুঝলেন, এদের মনে অলীক প্রেতাত্মার ভয় ঢুকেছে, এখনি হয় তো গ্রামে গিয়ে প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে সিরনি দেওয়া শুরু হয়ে যাবে। তাই তিনি অনেক বুঝিয়ে তাকে নিবৃত্ত করলেন এবং অবশেষে সবাইকে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন এবং এক মনে চিন্তা করতে লাগলো। অবশেষে ভাবলেন,—এমনও তো হতে পারে যে, উঁচু ঢিপিটার ঠিক ঢালুর দিকে সৈনিকরা থাকে বলে তারা সে আলো দেখতে পায় না; আর দূর থেকে গ্রামবাসীরা তা সহজেই দেখতে পায়। তিনি খবরটা কমাণ্ডারের কানে তুললেন! সেই রাত্রে পরীক্ষা করে দেখা গেল, ব্যাপারটা সত্যি। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল,—ওই লেবুবাগান থেকে কোন্ লোক

রাত্রিতে শত্রুর উদ্দেশ্যে সংকেত পাঠায় ? কমাণ্ডার কয়েকজন সুনিপুণ কর্মতৎপর বিশেষজ্ঞ এবং কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে সেই রাত্রে সেই বাগানে পাঠালেন।

* * *

প্রায় আধঘণ্টা পরে কর্মচারীরা যাকে ধরে নিয়ে এলো, তাকে দেখে কমাণ্ডারের চক্ষু-স্থির। আরে, এ যে সেই পাগলটা, যাকে তিনি একবার ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ আবার কী করলে ? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান কমাণ্ডার। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করেন,—"পাগলটা যদি সত্যি সত্যি আলো জ্বালিয়েও থাকে, তবে আলো জ্বালবার সামগ্রীই বা কোথায় ? বাল্‌ব্, ব্যাটারী কিছুই তো নেই। সমস্ত বাগানটাই তো আমাদের নখদর্পণে। এসব ও ব্যাটা লুকিয়েই বা রাখবে কোথায় ?"

—"সবই আছে স্যার।"—বৈজ্ঞানিক মিঃ রায় হেসে বলেন—আমরা একবার ওকে সার্চ করে ওর পোঁটলায় যে সব আজেরাজে জঞ্জাল দেখেছিলাম, তার মধ্যেই আছে আলো জ্বালবার সামগ্রী।"

—"বলেন কি ?"

—"হ্যাঁ সার, তবে ও ব্যাটা একটু চালাক কিনা ! তাই সাধারণ ব্যাটারী, বাল্‌ব্ এসব রাখলে পাছে আমাদের চোখে ধরা পড়ে, সে জন্যে গাছে ফলন্ত ব্যাটারী আর Sparking bulb (স্পার্কিং বাল্‌ব্)-এর সাহায্য নিয়েছে।"

—"অবাক্ কাণ্ড ! এসব ও পেলো কোথায় ?"

তার উত্তরে মিঃ রায় পাগলের (ওরফে শত্রুর গুপ্তচর) পুঁটুলির জঞ্জালগুলো একে একে দেখাতে লাগলেন। কাঁচের চোঙটা তুলে ধরে বললেন,—"এটা দেখছেন স্যার ? মোংরা মাখানো একটা বায়ু-নিরুদ্ধ কাঁচের চোঙ-এর মধ্যে আছে বিশেষ ধরনের গ্যাস।" তারপর ভাঙ্গা ব্যাটারীর গ্যাস-কার্বন-দণ্ড দেখিয়ে বললেন, "এটা হলো কার্বন রড। দুটো রড, চোঙের দুদিকে লাগিয়ে বিদ্যুৎ (current) পাঠালে এটা উজ্জ্বল আলো দেয়।"

—"আশ্চর্য !—কিন্তু carbon rodএ sparking করবার জন্য তো ব্যাটারীর দরকার—সেটা পেলো কোথায় ?"

স্মিতহাস্যে মিঃ রায় বললেন—"আজ্ঞে সেটাই তো ফলন্ত ব্যাটারী। শুনলে অবাক্ হবেন যে, সমস্ত বিদ্যুৎশক্তি জুগিয়েছে এই দুটি জিনিস"—বলে তিনি কয়েকটি পাতিলেবু আর একগোছা তার দেখালেন।

—"অবাক্ কাণ্ড ! প্লিজ বলে যান কি করে হলো।"

—"এটা হলো বিজ্ঞানের ব্যাপার। বিজ্ঞানে আছে,—কোনইলেকট্রোলাইট(Electrolyte) দুটি বিভিন্ন ধরনের তড়িৎদ্বার (Electrode) অ্যাসিড, লবণ ইত্যাদির দ্রবণে রেখে

তাদের আগা দুটো জুড়ে দিলে কারেণ্ট (current) চলতে থাকে। এই পদ্ধতিতে ব্যাটারী কাজ করে। এই যে, লেবু দেখছেন, এতে আছে সাইট্রিক অ্যাসিড (cytric acid)। এটা একটা ভালো ইলেক্‌ট্রোলাইট। আর এই যে তারগুলো—এর মধ্যে অর্ধেক তামার আর বাকী দস্তার তার। সবই ও ব্যাটার কাছে পাওয়া গেছে। এখন প্রতিটি লেবুর ভেতর একটা তামা এবং একটা দস্তার তার ঢুকিয়ে, একটা লেবুর তামার তারের সাথে অপরটির দস্তার তারের সঙ্গে জুড়ে ক্রমশঃ একটা বর্তনী তৈরি করে যদি তার দুমুখ জুড়ে দেওয়া যায়, তবে কারেণ্ট চলতে থাকে। এই সারি যত বড় হবে বিদ্যুৎ প্রবাহের শক্তিও তত বেশী হবে। এর ফলে কিন্তু লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড আর্দ্রবিশ্লেষিত (Hydrolysed) হয়ে লেবুটা পচে যায়। এই হতভাগা এইভাবে রোজ এক একটা লেবু গাছের দফারফা করতো। এই করে সে যেমন আমাদের ওপর শত্রুর বোমা ফেলিয়েছে, তেমনি গরিব চাষীর বাগান ধ্বংস করেছে। প্রত্যেকটি লেবুতে যে দাগ দেখা গেছে, তা এই তারের দাগ, পোকা নয়।"

রাগে কমাণ্ডারের মুখচোখ লাল হয়ে গেল। আর আশ্চর্য ব্যাপার, পাগল আর সে পাগল নেই। সে তখন কমাণ্ডারের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছে। কিন্তু সামরিক আইনে ক্ষমার স্থান নেই। তার কঠিন সাজা হয়েছিল।

কি করে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছিল জানি না, তবে এর পর ওই বাগানে আর আলো জ্বলেনি এবং তার ফলে বোমাও পড়েনি।

স্থান সংকুলন না হওয়ায় দ্বিতীয় পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখাটি প্রকাশ করা গেল না। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন শ্রী অলোক চক্রবর্তী।

৬৭৮ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

নতুন ধাঁধা

১। সার বেঁধে দুই দল আছি মুখোমুখি,
দিনরাত রেশারেশি চলে ঠোকাঠুকি।
একবার পড়ে পড়ে ফের উঠি তেড়ে।
আবার পড়িলে যাব রণভূমি ছেড়ে। —শ্রীঅমৃতলাল বসু, জলপাইগুড়ি।

২ গায়ে সে দেয় না হাত,
মেরে করে কুপোকাৎ। —কুমারী রঞ্জা, কলিকাতা।

৩। মাঝ কাটলে মাছ পাবে,
হাত বাড়ালে আমায় পাবে। —সোমা চক্রবর্তী, গৌহাটী—৮।

গত আশ্বিন সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। ৩৬ জন

২। ১২৩৪
১২৩
———
১১১১

৩। গুর্খা, আসামী, পাঞ্জাবী।

গত ভাদ্র সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—উদয়ন, মা, পিসি, দিদা ও বাণী—এস. কে. দেব রোড ; আশীষকুমার রায়—নেতাজীনগর ; ভোলা, তারু, পাম্পাই—শ্যামপুকুর লেন ; বাবু, পুলপুলি, রীতা, সজল ও বুটু—যাদবপুর ; গৌতম, কুমকুম, পপু ও জয়দেব—কলিকাতা-২০ ; সোমা, রুমা, দীপক, বুলু, স্বপন ও মিণ্টু চট্টোপাধ্যায়—দেশবন্ধুনগর ; ভারতী, মণিকা ও সান্ত্বনা রায়চৌধুরী—বাসুদেবপুর মেন রোড ; রথীন, তপন, বুম্বা, টুকু, বুজু, মায়া ও ছবি—বেহালা ; সিদ্ধার্থ, চন্দন, অরুণ, তমাল, সব্য ও ভোম্বল—নেতাজীনগর ; মিঠু, চঞ্চল, সজল, কাজল ও মুটকী—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড ; স্বাতী মিত্র—সুকিয়া স্ট্রীট।

২৪ পরগনা—বাবুল, দুষ্টু, ঝণ্টু, শিখা, রেখা ও শ্যামল কর—কাঁচড়াপাড়া ; অমিত, সুমিত, বরুণা ও তথাগত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া ; শঙ্কর, নেপাল, দিদি ও বৌদি-শ্যামনগর ; আশীষ, গৌতম, শৈবাল ও মীরা—নৈহাটী ; নীলরতন মুখার্জী ও দীপক রায়—বেঙ্গল এনামেল ; ঋষিপদ ও বিষ্ণুপদ রায় সমাদ্দার—বেঙ্গল এনামেল ; মুনু, জুনু, রুনু, ঝুনু ও টুটুন বসাক—কাঁচড়াপাড়া ; বাবা, মা, কাকু, ঝণ্টু ও পুতুল—ডায়মণ্ডহারবার।

হাওড়া—উদয়, পুলক, পিয়ালী ও পল্লব—পঞ্চাননতলা রোড ; খোকা, সুশান্ত, মিঠু, নরেশ, নীহার ও নিধু—কাসুন্দিয়া রোড ; দেবাশিস, কেদারনাথ, প্রদীপ, কাবেরী ও কৃষ্ণা—হাওড়া-৪।

হুগলী—গৌরাঙ্গ, কিশন, তপন ও গৌতম—বৈঁচি ; দাদু, বড়মা, মা, রবীন, সিক্তা ও চন্দনাথ—নারায়ণপুর ; সমু, কলু, শুভ, অপু, দীপু, তুহিন, বৌদি ও পাঁচু—রিষড়া ; মা, বাবা, জেঠা, বড়মা, কেয়া, ভাস্কর ও কেকা—বৈঁচিগ্রাম ; ঠাকুমা, মা, বাবা, পিসী, পিসেমশাই, রীতা, মিতা, খোকা প্রভৃতি—এক্সাস।

নদীয়া—অলকনন্দা, অচিন্ত্য ও অনিন্দ্যকুমার দাস—কৃষ্ণনগর।

মুর্শিদাবাদ—লক্ষ্মীকান্ত, ঝর্ণা, টুটুল ও মিঠু—বহরমপুর।

জলপাইগুড়ি—রাসবিহারী রায়—মেটেলী ; শুভাশীষ, ব্রততী, ভাস্বতী ও শাশ্বতী ভদ্র—আলিপুরদুয়ার।

বিহার—কিশলয়, করবী, কৌশিক, রাজকিশোর ও বিকাশ সিংহ—নারকাটিয়াগঞ্জ ; বুটু, স্বপন, সলিল, সমীর, বাবু, বুকু ও তেজু—খগৌল।

আসাম—অসীম, আশীষ, প্রদীপ, বাপি, মা ও বাবা—ডিব্রুগড় ; বিপ্লব, অপর্ণা, সুমন, বাবা, রাঙ্গামণি, সোম ও কাকামণি—রিলবং ; মা, বাবা, শিলি, পার্থ, খোকন, শম্পা, শিবু প্রভৃতি—রিলবং।

রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি গড়ে তোলে—স্বাস্থ্য রক্ষা করে দিনের পর দিন।

সুজাতা সব সময়েই চালাক আর চটপটে। আর সেটা বজায় রাখতে ওর মা রোজ ওকে খেতে দেন **হরলিক্স**; যা খেলে শরীরে বল হয়, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে আর আসে বাড়তি শক্তি।

সুচিত্রা দেবীর মত দুনিয়ার সব মায়েরাই **হরলিক্সের** ওপর বিশ্বাস রাখেন—আর প্রায় ১০০ বছর ধরে ডাক্তাররাও এটি খেতে পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

'হরলিক্স'—
পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

"হরলিক্সে পুষ্টিকর খাদ্যগুণ রয়েছে যা স্বাস্থ্য ভাল রাখতে খুবই সাহায্য করে। তাছাড়া, হরলিক্স হজম করাও খুব সহজ। আমার পরিচিত সুস্থসবল পরিবারের সকলেই রোজ হরলিক্স খান।"

হরলিক্স
রেজিস্টার্ড
ট্রেডমার্ক

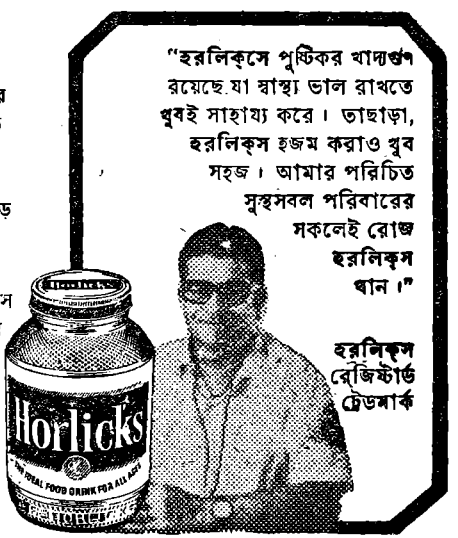

HL 5595 A-B-I

গড়গড়িবাবুর গাড়ি

গল্প • অদ্রীশ বর্ধন ছবি • নারায়ণ দেবনাথ

গড়গড়িবাবু মস্ত বৈজ্ঞানিক। তার বৈঠকখানার চেয়ার জঞ্জাল থেকে তৈরী প্লাস্টিক দিয়ে, টেবিল চুল থেকে তৈরী কাঠ দিয়ে। তাঁর আবিষ্কৃত ঘাসের চপ খেলে বাড়তি ভিটামিন খাওয়ার দরকার হয় না।

গড়গড়িবাবুর সবচাইতে আজব আবিষ্কার তাঁর উড়ন্ত গাড়ি। এ-গাড়ি ডাঙায় চলে গড়গড়িয়ে, জলে চলে পাখনা নেড়ে, আকাশে ওড়ে ডানা মেলে। গাড়িটা তাঁর চলন্ত কারখানা। গাড়ির মধ্যেই তিনি গবেষণা করছেন আর আবিষ্কার করছেন।

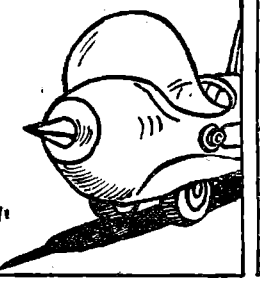

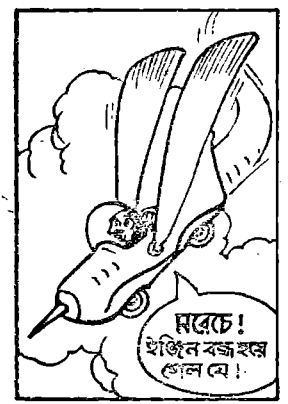

তবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে বলো!
এমনি সাবানে কাজ হচ্ছে না!
সেটা আগে বললেই তো হতো!
ঘটাং!
এই নাও! এই দিয়ে বাচ্চাদের হাত ধুয়ে খেতে বলবে—হাতের জীবানু ঘায়েল হবে—পেটের অসুখ হবে না। খেলেধূলে এসে মাখতে বলবে—চামড়ার রোগ হবে না!
আর যদি না হয় তো আবার তোমাকে আছাড় মারবো হিঃ হিঃ হিঃ!
দুম!
ওঃ! খুব বেঁচে গেছি!
দিন কয়েক পরে
তোমার বেনজিটল সাবান আরো কিছু দিও বাপু! বড় ভালো সাবান! ছেলেপুলেদের পেটের অসুখ আর হচ্ছে না—চামড়ার রোগও হচ্ছে না! কি বর চাও বলো?
চাঁদে যাওয়ার বর!
তথাস্তু!
Benzytol SOAP
ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

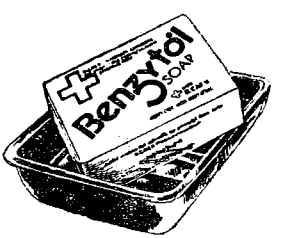

বাড়ন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের সাথী-ইনক্রিমিন* !

বাড়ন্ত বছর কটা সবসময় আপনার ছেলেমেয়েদের খেতে দিন ইনক্রিমিন টনিক। ইনক্রিমিন সিরাপে রয়েছে— উপকারী সব ভিটামিন, আয়রন আর শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড—স্বাস্থ্যের পক্ষে সব অপরিহার্য দ্রব্য।

বাড়ন্ত বয়েস!

ড্রপস্—২ মাস থেকে ২ বছরের শিশুদের জন্যে
সিরাপ—১৪ বছর পর্যন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্যে

ইনক্রিমিন*

ইনক্রিমিন টনিক - বাড়ন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্যে অতুলনীয় !

ডাক্তারদের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম Lederle সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ।

* আমেরিকার সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

SISTA'S-INC-48 BEN

নতুন-ফসফোমিন নির্মাতাদের দ্বারা তৈরী আরেকটি উৎপাদন

ফসফোমিন আয়রন

...কারণ মেয়েদের জন্যে আয়রনের বেশী প্রয়োজন হয়

মেয়েদের জন্যে আয়রনের দরকার অনেক বেশী। কারণ প্রতি-মাসে তাঁদের শরীর থেকে আয়রন বেরিয়ে যায়। শরীরের পক্ষে আয়রন খুবই দরকার। তাই আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করাও প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় আর শিশুকে স্তন্যপান করাবার সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোকের আরো বেশী আয়রনের প্রয়োজন হয়। কারণ সন্তানের জন্যেও তো আয়রনের দরকার!

আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করতে আর শরীরে যথাযথ মাত্রায় আয়রন বজায় রাখতে আপনি নিন ফসফোমিন আয়রন—প্রতিটি নারীর জন্যে একটি অত্যাবশ্যক টনিক্।

ফসফোমিন আয়রন স্বাস্থ্যকর লাল রক্ত-কণিকা গড়ে তোলে আর আপনার যৌবনশ্রী ফিরিয়ে আনে।

ফসফোমিন আয়রনে সব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও পাবেন। ফলে আপনি হয়ে উঠবেন যেমন কর্মঠ তেমনি প্রফুল্ল।

আজ থেকেই ফসফোমিন আয়রন খেতে শুরু করুন।প্রত্যেক দিন নিন ফসফোমিন আয়রন

সব কেমিস্টের দোকানে ২টি সাইজে পাওয়া যায় : ২৪০ মি. লি. ও ৪৮০ মি. লি.।

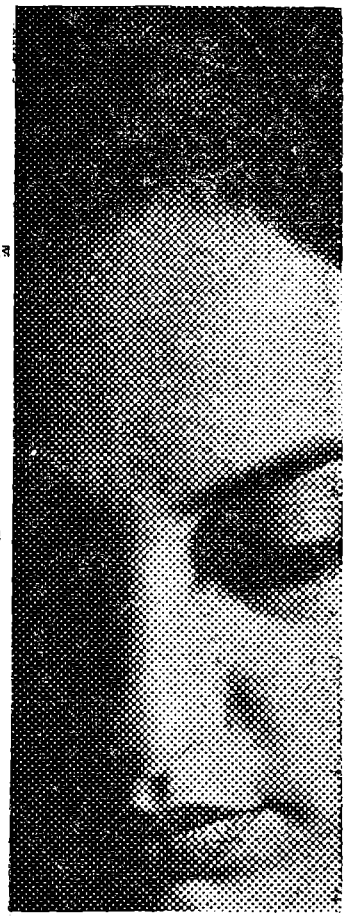

নতুন!
ফসফোমিন আয়রন-
মেয়েদের জন্যে বিশেষ
ফর্মুলায় তৈরী
প্রথম টনিক

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

ফসফোমিন করমচাঁদ প্রেমচাঁদ প্রাইভেট লিমিটেডের একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক। ও ই. আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক আর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকর্তা হলেন কে পি পি এল।

Shilpi-HPMA-7A/73 Ben

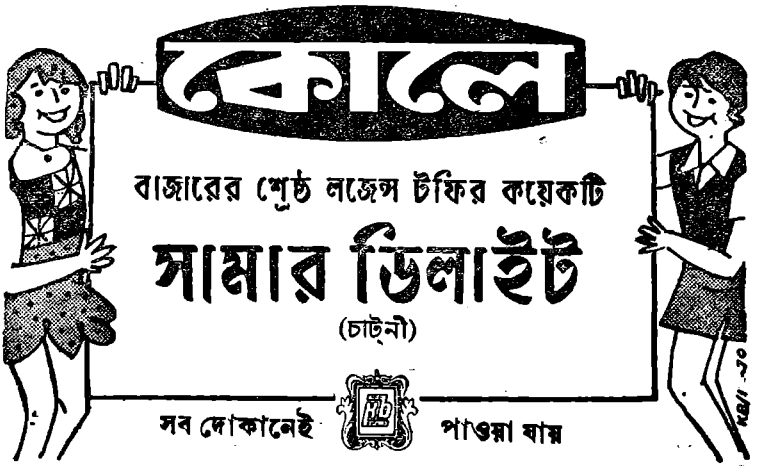

বাজারের সেরা অভিধান—

সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত

নূতন মুদ্রণ

সরল বাঙ্গালা অভিধান মূল্য টা. ২৮·০০

ডাকমাসুল সহ টা. ৩৩·০০ স্থলে টা. ২৮·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Century Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 13·00

Century Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 13·00

ডাকমাসুল সহ টা. ১৬·০০ স্থলে মাত্র টা. ১৩·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Pocket Dictionary (ENG.-BENG.) } শীঘ্রই নূতন সংস্করণ

Pocket Dictionary (BENG.-ENG.) } প্রকাশিত হচ্ছে

NEW BENGAL PRESS (Private) Ltd., 68, College Street, Calcutta-12

ছেলেমেয়েদের কাছে কয়েকখানি লোভনীয় গল্পের বই

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
অজানার উজানে— ১·৫০
[দুই কিশোরের অদ্ভুত অ্যাড্‌ভেঞ্চার-কাহিনী]

রমেশচন্দ্র দাসের
অজ্ঞাত দেশ— ১·৫০
[পলটুর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প]

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শিকারের গল্প— ১·৫০
[আসামের জঙ্গলে শিকার-কাহিনীর]

শ্রীসুকুমার দে সরকারের
হানাবাড়ী— ১·৫০
[পোড়ো বাড়ীর ভৌতিক রহস্য]

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহার
মা ভাই বোন— ১·৫০
[ডাকাত দলের লোমহর্ষক কাহিনী]

শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়ের
বাহাদুর— ১·২৫
[কুমীরের সাথে বাহাদুরের দুঃসাহসিক লড়াই]

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কম্যাণ্ডার কবুতর— ২·০০
[বিগত যুদ্ধে পায়রা কিভাবে এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে সংবাদ আদান-প্রদান করেছিল···চাঞ্চল্যকর কাহিনী]

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের
সমুদ্রের রহস্য— ২·০০
[সমুদ্রের তলায় যে কত রহস্য লুকানো আছে তার এক চাঞ্চল্যকর কাহিনী]

গদাধর নিয়োগীর
মিনু ও কাপালিক— ২·০০
[সেকালে কাপালিকের নরবলির এক লোমহর্ষক কাহিনী]

যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শতবর্ষ পরে— ২·০০
[ইংরেজের অত্যাচার কাহিনী]

শ্রীমনীগোপাল চক্রবর্ত্তীর
আকাশ গঙ্গা— ২·০০
[ভারতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থের ভ্রমণ-কাহিনী]

সুষমা সেনের
ঈশ্বরের মৃত্যু— ১·৫০
[পরমেশগঞ্জের ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক অভিযান-কাহিনী]

দেব সাহিত্য কুটীর, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলি-৯

এবার পূজায়
দেব সাহিত্য কুটীরের
ছোটদের জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপহার

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ

বিশ্বের নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য এটি এক অসাধারণ বই। এই বই পড়ে বহু অজানাকে জানা যাবে, এর পাতায় পাতায় বিচিত্র ছবি কত না দেখা জিনিসকে চোখের সামনে তুলে ধরবে। ছবিতে ভরপুর প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠার বইটি না দেখলে না পড়লে বোঝাই যাবেনা কি বিচিত্র এই বই। কত সুন্দর, কত জ্ঞানের ভান্ডার এই বই।

২৫'০০ টাকা পাঠালে রেজেষ্টারী করে পাঠান হয়

দেব সাহিত্য কুটীর

২১, ঝামাপুকুর লেন • কলিকাতা - ৯